চীনের কালজয়ী কিশোর গল্প

॥ সম্পাদনা ॥

শ্যামল সেন

॥ অনুবাদ ॥

সমর ঘোষ   তপন চক্রবর্ত্তী

গৌতম মুখার্জী   শ্যামল সেন

নব সাহিত্য প্রকাশনী

১২৮/১এ, রাজা রামমোহন সরণী

কলকাতা : ৭০০০০৯

॥ প্রচ্ছদ শিল্পী ॥

অমলেশ ঘোষ

॥ মুদ্রণ ॥

শান্তি মুদ্রণ

৩২/৩, পটুয়াটোলা লেন,

কলকাতা ঃ ৯

॥ অলংকরণ ও অঙ্গসজ্জা ॥

সুব্রত সেন

ও

কিশোর শিল্পী অজয় ঘোষ ও সুজয় ঘোষ

প্রথম প্রকাশ ঃ অক্টোবর, ১৯৬০

শ্রীমতী চন্দনা ঘোষ কর্তৃক নব সাহিত্য প্রকাশনী, ১২৮/১এ, রাজা রামমোহ
সরণী, কলকাতা-৯ (শ্রদ্ধানন্দ পার্কের পশ্চিমে) থেকে প্রকাশিত
এবং শ্রীবিষ্ণুপদ রায় ও শ্রীঅসীমকুমার সাহা কর্তৃক দি প্যারট প্রেস
৭৬/২, বিধান সরণী, (ব্লক কে-১), কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত।

উৎসর্গ—

আজকের কিশোর, আগামী দিনের মানুষকে—

এই প্রকাশনার অন্যান্য গ্রন্থ ঃ

- লু স্যুনের নির্বাচিত প্রবন্ধ ॥ সাত টাকা
- লু স্যুনের কবিতা বুনো ঘাস (২য় সংস্করণ) ॥ চার টাকা
- চৌ এন-লাই-এর কবিতা ও শিল্প-ভাবনা ॥ পাঁচ টাকা

সূচীপত্র



ভূমিকার পরিবর্তে

পৃথিবীর সকল মানুষের কাছে চীনদেশ আজ যেন বিস্ময়। বিশেষ করে আমাদের দেশ ভারতবর্ষে। আমাদের স্বাধীনতার দু'বছর পরে চীনদেশের মানুষ স্বাধীন হয়েছে অথচ এরই মধ্যে ওরা সবদিকে কত এগিয়ে গেছে।

পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতার অন্যতম এই দেশে সামাজিক-রাজনৈতিক নানা উত্থান পতনের মধ্যে সাহিত্য ও শিল্পের চর্চাও বহুকাল ধরেই চলে আসছে। দেশ বিদেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-সম্ভারের ইতিহাসে চীনদেশের নাম অবশ্যই প্রথম সারিতে থাকছে। আজ সর্বত্র যখন পরিণত বুদ্ধির পাঠকদের জন্য অসংখ্য মননশীল বিষয়ের অফুরাণ আয়োজন তখন ভাবতেই হয় শিশু বা কিশোর-বয়সী পাঠকের হাতে সত্যিকারের কী-ই বা দেবার রইল। বাংলা ভাষায় মূলতঃ চীনা সাহিত্যের পরিচয় আমাদের কাছে নেই বললেই চলে। ছোটদের মন-তৈরী আর মানুষ-হবার উপযোগী গল্প-কথা কোথায়?

ঠিক এই ভাবনা থেকেই এই গল্প সংকলনের উদ্যোগ। তবে কেন চীন-দেশ? কারণ একটাই, আমাদের দেশের যৌবন পেরিয়ে যাওয়া পাঠক চীন-দেশকে নিয়ে নানা সংশয়, বিতর্ক, আবেগে নিজেদেরকে জড়িয়ে রেখেছেন, অন্যদিকে যৌবনমুখী কিশোর অথবা শিশুদের ভাবনায় এই দেশ যেন বা কেমনতর! তাকে জানাটাই তার প্রথম কাজ। বিতর্ক বা বিস্ময় পরের কথা। তাছাড়া আমাদের প্রচলিত শিশু বা কিশোর সাহিত্যের মাটিতে এত বেশী কাঁটাগাছ আর চোরাবালি, যে পথ চলতেই দিশাহীন। পরিণত বয়সের মানুষ-গুলোই যখন টলতে টলতে এগোয় তখন কিশোর বয়সীদের তো অনায়াসেই পথ ভুলিয়ে স্বপনপুরীতে নিয়ে যাওয়া যায়। সেখানে মাটি নেই, মানুষ নেই, অভাব-দুঃখ খেটে-খাওয়ার তাগিদ নেই—আছে প্রাচুর্য, অপরূপ পরী-প্রেম, দৈত্য-দানো-ভূত-প্রেত-ডাইনী-পিশাচের অলৌকিক দাপাদাপি আর কল্পিত দেব-দেবীর অপার করুণা। এরই সাথে জুজুর ভয়, ভুলে ভরা মিথ্যেমায়ার গপ্পো শুনিয়ে কিশোর মনকে অবশ করে রাখার বিচিত্র আয়োজন। বিজ্ঞান তো দূরের কথা অজ্ঞ আর অন্ধ-বিশ্বাসের অবাধ প্রচার। আমাদের শিশু-কিশোরদের বই-এর ঝুলিতে লুইস ক্যারল, এডওয়ার্ড লিয়ার, ঈশপ, ডিকেন্স অবনঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রকিশোর, সুকুমার, সুনির্মল, খগেন মিত্র প্রমুখ

অনেকের লেখাই অনায়াসে জায়গা করে নেয় ঠিকই কিন্তু শিশু সাহিত্যের যেটুকু সুস্থ ও বিজ্ঞানসম্মত ভাবনা ঐতিহ্যসূত্রে হাতে পাওয়া যায়, তা হাল-ফিল শিশু লেখকদের বাণিজ্যিক ও অসামাজিক লালসার ফলে অমূলে নষ্ট হচ্ছে। হয়তো বা এ কারণেই স্বদেশী রচনাকে আপাতত পাশে রেখে বিদেশের দিকে চোখ ফেরাতে হয়।

বর্তমান গল্পগুচ্ছের গল্পগুলিতে চীনদেশের পুরনো ও নতুন সমাজের দুটো ছবিই পাঠকের কাছে তুলে ধরা হয়েছে। আশ্চর্যের কথা হল চীনা লেখকরা ছোটদের বুদ্ধি, স্বদেশচেতনা ও আবেগকে কোথাও ছোট নজরে দেখাননি, যেন অনেকটাই তারা পরিণত। শিশু বা কিশোর ভাবনা যে দেশকালের বাইরে অবাস্তব একটা শূন্যলোকের কল্পনা নয়, মাটি ও মানুষের স্বার্থেই তার বিকাশ ও পরিণতি আলোচ্য গল্পগুলি তার যথার্থ প্রমাণ। আমরা বেশ কিছু সংখ্যক মূল গল্প নানাসূত্রে অনুসন্ধান চালিয়ে সংগ্রহ করেছি। বয়সভেদে যে কোনো পাঠকের কাছে সময় নিরিখে যার স্থায়ী মূল্য থেকে যায়, এমনতর ১৮টি গল্প-কথা এই গ্রন্থে আমরা সংযোজিত করেছি।

এই ধরণের একটি গল্পগ্রন্থের পরিকল্পনা নব সাহিত্য প্রকাশনীর মত ক্ষুদ্র সামর্থ্যের প্রকাশন-সংস্থার পক্ষে মাত্রাতিরিক্ত দুঃসাহসিকতার কাজ। আমাদের উৎসাহ-উদ্যোগ তাঁদের প্রচেষ্টাতেই সফল হয়েছে একথা নির্দ্বিধায় স্বীকার করছি। অনুবাদ কাজে সকলেই নিষ্ঠার সাথে নিঃস্বার্থ দায়িত্ব পালন করেছেন। কথাশিল্পী অধ্যাপক তপোবিজয় ঘোষ প্রয়োজনীয় মূল্যবান ভূমিকাটি লিখে দিয়েছেন। গ্রন্থটির সুন্দর প্রচ্ছদ শিল্পের কৃতিত্ব শিল্পী অমলেশ ঘোষের। এই সাথে অন্যান্য অলংকরণ ও অঙ্গসজ্জার কাজে যথেষ্ট উৎসাহ নিয়ে হাত লাগিয়েছে দুই শিশু-শিল্পী অজয় ও সুজয় এবং আর্ট কলেজের তরুণ ছাত্র-শিল্পী সুব্রত। এরা সকলে আমাদের স্নেহভাজন। কবি সুমর জোয়ারদার প্রুফ দেখা ও অন্যান্য কাজে যথাসাধ্য পরিশ্রম করেছেন। এদের সকলের কাছেই আমরা কৃতজ্ঞ।

শেষ কথা, এই গল্পগ্রন্থটি আমরা উৎসর্গ করছি—আজকের কিশোর, আগামী দিনের মানুষকে।

শ্যামল সেন

১২৮/১এ, রাজা রামমোহন সরণী
কলকাতা-৯

ভূমিকা

আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র চীন সম্পর্কে আমাদের জিজ্ঞাসা ও কৌতূহলের অন্ত নেই। প্রায় নব্বই কোটি মানুষের দেশ মহাচীন পৃথিবীর বৃহত্তম ও মহত্তম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এই দেশে ক্ষুধা নেই, দারিদ্র নেই, মানুষের উপর মানুষের অত্যাচার কিংবা শোষণ নেই, জিনিসপত্রের দাম-বাড়া নেই, লেখা পড়া শেষ করে তরুণ তরুণীদের বেকার বসে-থাকার যন্ত্রণা নেই। মানুষের অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষার মৌলিক সমস্যাগুলির সমাধান করে এই দেশ জ্ঞান-বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারে সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে দ্রুত বেগে। সমগ্র বিশ্বের বিস্মিত দৃষ্টি এখন মহাচীনের দিকেই।

মাও-সে-তুঙের মত মহান বিপ্লবীর কর্মক্ষেত্র এই চীনের রাজনৈতিক উত্থানের ইতিহাস যেমন গৌরবময়—তার সংস্কৃতির ইতিহাসও তেমনি প্রাচীন ও সমৃদ্ধশাল   রতবর্ষের সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে একদা তার সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ। এশিয়ার বুকে এই দুটি দেশই ছিল সুপ্রাচীন মানব-সভ্যতার বর্ণোজ্জ্বল লীলাভূমি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের ছেলেমেয়েরা যে আবেগ ও আকর্ষণ নিয়ে পুঁজিবাদী ইউরোপের ইতিহাস মুখস্থ করে, তার শতভাগের একভাগ দিয়েও প্রতিবেশী চীনের প্রতি তাকানোর সুযোগ পায় না। ফলে আমাদের ঘরের কাছের মানুষগুলি আমাদের দূরেই থেকে যায়। আত্মীয় হয়ে ওঠে না।

একটি দেশের মানুষকে জানার শ্রেষ্ঠ উপায় তার সাহিত্যকে জানা। কেন না সাহিত্যেই দেশের হৃদয় উন্মোচিত হয়, তার সুখদুঃখ আনন্দবেদনার অনুভবগুলি জীবন্তমূর্তি লাভ করে। সাহিত্যই দেশের সঙ্গে দেশের, মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের সেতু রচনা করে। এ বিষয়েও আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, অনুবাদের মাধ্যমে ইংরেজি বা ফরাসী সাহিত্য যে-পরিমাণে আমাদের কাছে পরিচিত হয়ে উঠেছে চীনের সাহিত্য তা হতে পারে নি। এই মহান দেশটির প্রতি আমাদের বুদ্ধিজীবীদের এক বৃহৎ অংশের ইচ্ছাকৃত মৌনী-ভাব ও

রাজনৈতিক বিরূপতাই এর প্রধান কারণ। তাই বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক লু স্যুনের রচনাবলীর সঙ্গে বাঙালি-পাঠকের কোনো অন্তরঙ্গ পরিচয় আজও গড়ে ওঠে নি।

বর্তমান গ্রন্থের অনুবাদকগণ চীনের কিশোর সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের ঘরের ছেলে মেয়েদের পরিচয় করিয়ে দিতে আগ্রহী হয়েছেন। চীনাভাষা থেকে নয়, ইংরেজি ভাষা থেকেই তাঁরা ভাষান্তরের কাজ করেছেন। ফলে একে অনুবাদের অনুবাদ বলা যায়। কিন্তু তাতে ক্ষতি নেই। ফরাসী-গ্রীক-জার্মান-রুশ সাহিত্য এ দেশে এ ভাবেই চিরকাল অনূদিত হয়ে আসছে। তাতে মূলের রস উপভোগে বিশেষ বাধা ঘটে নি।

বাংলার নিজস্ব কিশোর-গল্প এখনও সাবালকত্ব অর্জন করে নি। এই বিশ-শতকের শেষ ভাগে যখন দিকে দিকে মুক্তিকামী মানুষের বিদ্রোহের জয়পতাকা উড়ছে, আর গ্রহান্তরের বুকে বিজ্ঞানের নিত্য নতুন ইতিহাস রচিত হচ্ছে—তখনও আমাদের কিশোর-সাহিত্য উদ্ভট-কল্পনা, লোমহর্ষক গোয়েন্দা কাহিনী অথবা ভূতপ্রেতদৈত্যদানবের আতঙ্ক-পাণ্ডুর অবাস্তব অর্থহীন কথার ফুলঝুরি-মাত্র হয়ে আছে। পোড়োবাড়ির গর্ভে কাল্পনিক মৃতব্যক্তির হত্যারহস্য উদ্ঘাটনে আমাদের লেখকেরা যে-পরিমাণে সচেষ্ট, তার সিকিভাগ শ্রম ও বুদ্ধি ব্যয় করে তারা যদি সমাজের জীবন্ত মানুষগুলির হাঁটা-চলা, সংগ্রাম ও বিদ্রোহের চিত্র অঙ্কন করতেন তাহলে আমাদের কিশোরদের মনের ভূগোল অন্যরকম হয়ে উঠত। আমাদের লেখকেরা সামাজিক দায়িত্বকে সর্বপ্রযত্নে পরিহার করাকেই লেখক-জীবনের সর্বোত্তম আদর্শ মনে করেন।

চীনের কিশোর সাহিত্যের ইতিহাস যে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের তা অনূদিত গল্পগুলির দিকে তাকালেই বোঝা যাবে। গল্পের লেখকেরা শুধু গল্প বলার জন্যই কলম ধরেন নি, সমাজ ও শ্রেণীসচেতন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শিক্ষকের মত তাঁরা কিশোর মনের কাঁচা ধাতুকে উত্তপ্ত করে কঠিন ইস্পাতে পরিণত করার সাধনায় নেমেছেন। কিশোরেরাই যে ভবিষ্যতের সুস্থ সমাজ ও দেশগঠনের নায়কত্ব লাভ করবে—এই সত্যকে সামনে রেখেই তাদের মন প্রস্তুত করার কাজে ব্রতী হয়েছেন।

সংকলনের অধিকাংশ গল্পই চীনে বিপ্লব সম্পূর্ণ হবার পূর্ববর্তীকালের রচনা। একদিকে বিদেশী জাপানী শত্রু, অন্যদিকে দেশীয় অত্যাচারী জমিদারশ্রেণী—এই উভয়ের বিরুদ্ধে চীনের জনগণ তখন মাটি কামড়ে মরণপণ

লড়াই করে চলেছে। সংকলনের কয়েকটি গল্পে আছে সেই লড়াই-এর চিত্র। দেশের দুর্দিনে শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে কিশোর-কিশোরীরাও পিছিয়ে ছিল না। শত্রুসৈন্যের ঘাঁটি থেকে তারা গোপন-সংবাদ বহন করে এনেছে, উপস্থিত বুদ্ধি প্রয়োগ করে শত্রুকে ফাঁদে ফেলেছে, শত্রুর হাত থেকে মেসিনগান ছিনিয়ে নিয়ে সম্মুখযুদ্ধে শত্রুকে তারা মৃত্যু উপহারও দিয়েছে। 'নলখাগড়া বিলের খুদে বীর' গল্পটি এমনি এক অসাধারণ কিশোরের বীরত্বপূর্ণ কাহিনী। এ গল্প পড়তে পড়তে একদিকে আনন্দে উত্তেজনায় মন যেমন রোমাঞ্চিত হয়, তেমনি আক্ষেপও জাগে, আমাদের দেশে গ্রামেগঞ্জে এমন কিশোরের জন্ম হবে কবে! 'জল নিমগ্ন কারাগার থেকে' গল্পটি জমিদারী-অত্যাচারের এক নির্মম চিত্র। অন্যদিকে 'কাকতাড়ুয়া' গল্পে প্রতীক ব্যবহারের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে দরিদ্র মানুষের প্রতি গভীর সমবেদনা ও ভালবাসার ছবি। 'বনের সঙ্গীত' গল্প বলতে চেয়েছে, সকল শিল্পের উৎস হল জনগণ এবং শিল্পের কাজই হল জনগণের সেবা করা। 'তিনটি অহঙ্কারী বিড়াল ছানা' গল্পে বোঝানো হয়েছে শ্রমের মর্যাদা, 'আমি রেলগাড়ী' গল্পে যৌবনশক্তির জয়গান, আর 'বানর শ্বেত-অস্থি দানবীকে দমন করলেন' গল্পে আশ্চর্য শিল্প কৌশলের সঙ্গে প্রচার করা হয়েছে যে, 'অহিংসা পরম ধর্ম' হলেও হিংস্র শক্তিকে হিংসা দিয়েই পরাভূত করতে হয় কারণ, সমাজশত্রুদের নির্মম হয়ে নিহত করতে না পারলে সুযোগ পাওয়ামাত্র তারা আমাদেরই হত্যা করে।

গল্পকে উপভোগ্য করার জন্য লেখকেরা পুরাতন প্রথা মেনে অচেতন বস্তুকে সচেতন করেছেন, জীবজন্তুর মুখে মানুষের ভাষা দিয়েছেন, অশরীরী ভূতকেও শরীর দিয়েছেন—কিন্তু কোথাও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক ও সামাজিক বক্তব্য থেকে এক চুলও সরে যান নি। তাই তাঁদের ভূতের গল্প ভূত-তাড়ানোর গল্প হয়ে উঠেছে। সংস্কারের বেড়া ভেঙ্গে কিশোরমনকে উদ্দীপ্ত করার কাজে, শত্রুর প্রতি ঘৃণা ও দরিদ্র মানুষের প্রতি ভালবাসা জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁরা সবসময় সজাগ ও সতর্ক থেকেছেন।

যথার্থ কিশোরগল্প এই রকমই হওয়া উচিত। যা পড়তে পড়তে কখনো কিশোরদের চোখে জল আসবে, কখনও ঘৃণায় ফুঁসে উঠবে কচি বুকের পাঁজর, কখনো সাহসী সৈনিক হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে করবে রণক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধে।

এই সংকলনের সম্পাদক ও অনুবাদকগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ যে তাঁরা এমন একটি জীবন্ত উত্তপ্ত গ্রন্থ আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। ধন্যবাদ

প্রকাশককেও—যিনি কালোপযোগী এই গ্রন্থ প্রকাশ করে আমাদের কিশোর-বাহিনীর চেতনার মান উন্নত করার কাজে ব্রতী হয়েছেন। বাংলাদেশের ঘরে ঘরে চীনের এই গল্প-সংকলনটি পঠিত ও রক্ষিত হোক, বাংলাদেশের কিশোর-কিশোরীরা এই গল্প থেকে মুক্ত-জীবনের পাঠ গ্রহণ করুক, এই গল্পের দর্পণে নিজের দেশ আর দেশের শত্রুমিত্রদের চিনতে শিখুক, ভারত ও চীন—এই দুই মহান দেশের সহস্র কিশোরপ্রাণ ঐক্যসূত্রে বাঁধা পড়ুক।

আর, আমাদের বয়স্ক লেখকেরা শিখুন, সত্যকারের কিশোর-গল্প কি করে লিখতে হয়।



নলখাগড়া বিলের খুদে বীর

চ্যাং তে-উ

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে যে শত্রুপক্ষ তার টুটিমিয়াও-এর শক্ত ঘাঁটির জন্য একটি মেশিনগান ও কিছু রাইফেল পাঠিয়েছে এবং সেখানকার সৈন্যবাহিনীকে পরের দিন লিয়েন হুয়া শহর থেকে ঐ সব অস্ত্র নিয়ে আসবার নির্দেশ দিয়েছে। আমাদের জেলা পার্টি কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে অস্ত্রসস্ত্র আটক করা হবে। আর সেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আমাকেই। শত্রুরা তাদের অস্ত্র সংগ্রহ করে সিয়াওলুচুয়াং গ্রাম দিয়ে ফিরবে। আমাকে তাই ঐ গ্রামে যেতে হবে এবং সেখানকার গণফৌজের সাথে যুক্ত হয়ে শত্রুকে বিপথগামী করে উইশান হ্রদ নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানকার নলখাগড়া বিলে ওদের নিশ্চিহ্ন করতে হবে। এই হচ্ছে মোটামুটি পরিকল্পনা। নির্দেশ পাওয়া মাত্রই আমি সাধারণ লোকের পোষাক পড়ে নিলাম এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যাত্রা করলাম।

সিয়াওলুচুয়াং-এ যাবার পথে সন্ধ্যাবেলা অপ্রত্যাশিতভাবে আমি শত্রুর রক্ষী বাহিনীর মুখোমুখি পড়ে গেলাম। ফলে আমাকে তাদের সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হয়ে পড়তে হল। পাইমা নদীর তীর ধরে ছুটতে ছুটতে আমি তাদের সাথে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলাম। এক ডজনের মতো জাপানী আগ্রাসী ও ভাড়াটে সৈন্য আমাকে তাড়া করল। আমার মনে হচ্ছে যে আমি ধরা পড়ে যাবো। ঠিক সেই সংকটময় মুহূর্তে নদীর তীরে নলখাগড়াগুলো নড়াচড়া করে উঠল। ঘুরেই দেখি একটি ছোট ছেলের মুখ সেই নলখাগড়ার ভেতর থেকে বেড়িয়ে আছে। সে আমার দিকে চিৎকার করে বলল: "এখানে ঝাঁপ দিন, দেরী করবেন না!"

আমি দু'জন জাপানী সৈন্যকে ধরাশায়ী করে সেই নলখাগড়ার জলে ঝাঁপ দিলাম। তখনই কেবল বালকটিকে পরিষ্কার দেখতে পেলাম। ওর বয়স হবে

বছর বারো। ওর মাথা ও পায়ে কোন আবরণ নেই, আর জুতোজোড়া কোমরের বেল্ট থেকে ঝুলে আছে। হাতাহীন সাদা জ্যাকেট একটা কাঁধে ঝোলানো, আর হাতে রয়েছে মাছ ধরার বাক্স। পঞ্চাশের অধিক বয়স এক খুড়ো ওর পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। কোন সন্দেহ নেই, ওরা জেলে।

আমি হাত নেড়ে বললাম, "নলখাগড়ার ভেতর দিয়ে পালিয়ে যান! আমি ওদের আটকাব!"

এক ঝাঁক গুলি নলখাগড়ার মধ্য দিয়ে ছুটে গেল এবং আমার পাশের কিছু নলখাগড়া ভেঙে পড়ল। শত্রুরা আমাদের ঘিরে ফেলছে। আমি ভয়ংকর উত্তেজিত হয়ে পড়েছি। আমি গুলি চালালে এই দুজনকেও ওরা দেখে ফেলবে। আর না চালালে আমিই শত্রুর হাতে পড়ব। কারণ আমি এদের নাগালের মধ্যে এসে পড়েছি।

ছোট্ট ছেলেটা আমার সাদা জামার দিকে তাকাল। ওর বড় বড় সপ্রতিভ চোখ দুটো কুঁচকে গেল, যেন মনে হ'ল ও আমার সাদা জামার মধ্যে কি একটা আবিষ্কার করেছে। হঠাৎই সে তার কাঁধ থেকে জ্যাকেটটা টেনে নিয়ে বিলের ভেতরে চলে গেল।

নলখাগড়ার নড়াচড়া দেখে সতর্ক শত্রুরা চিৎকার করে উঠল এবং এলোপাথারি গুলি চালাতে লাগল।

একজন জাপানী সৈন্য ভুল চীনা ভাষায় চিৎকার করে বলল, "বেরিয়ে এস, মরা নেই!"

"তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এস! রাজার সৈন্যবাহিনী তোমায় পুরস্কার দেবে", একজন ভাড়াটে সৈন্য তোতাপাখীর মতো বলল।

আমি একটি হাত গ্রেনেড বার করলাম। চকিতে তার চাবি খুলে সেই খুড়োকে বললাম, "মাথা নীচু করুন। একদম নড়াচড়া করবেন না……।"

আমি শেষ করার আগেই একজন ভাড়াটে সৈন্য চিৎকার করে উঠল, "নদীতে একটা লোক রয়েছে। একজন অষ্টম বাহিনীর সৈন্য পালাচ্ছে!" নলখাগড়ার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখি হাতাহীন সাদা জ্যাকেট গায়ে একটা ছোট্ট শরীর জলের উপর উপুড় হয়ে ভাসছে। আমার হৃৎপিণ্ড থমকে গেল। ছোট্ট ছেলেটা না? শত্রুরা উন্মাদের মতো তীরের দিকে ছুটে গেল। আমি আমার পিস্তল বার করে গুলি চালিয়ে আমার দিকে শত্রুর নজর কাড়তে চাইলাম কিন্তু খুড়ো আমাকে বাধা দিলেন। আর একঝাঁক গুলি এসে ঐ ছোট্ট সাদা

জ্যাকেটটাকে ঝাঁঝরা করে দিল! সেটা ক্রমে ক্রমে ডুবে যেতে লাগল। শত্রুর নেকড়ের মতো চিৎকার থেমে গেল। চারিদিকে নিঃশব্দ নীরবতা……।

খুড়ো নলখাগড়ার ভেতর থেকে একটা নৌকা বার করলেন। আমি এক লাফে তার সামনে উঠে পড়লাম। তিনি নৌকাটা চালিয়ে তীর থেকে সরে গিয়ে উইশান হ্রদের দিকে যেতে লাগলেন। তারপর দ্রুত সিয়াওলুচুয়াং এর দিকে এগোতে শুরু করলেন।

খুড়ো গ্রামের প্রান্তে বাস করেন। তার স্ত্রী ঘরে প্রদীপের আলোয় পেট গরম করার জন্য একটা লাল রংয়ের কাঁথা সেলাই করছিলেন আর মনোযোগ দিয়ে বাইরের শব্দ শুনছিলেন। তার মুখে ছিল উদ্বেগের ছাপ। আমরা ঘরে ঢুকতেই তিনি আমাকে নিরীক্ষণ করে বললেন, "কমরেড, আপনার কি চোট লেগেছে?"

"না, কিন্তু ঐ ছোট্ট ছেলেটা……।" আমি উত্তর দিলাম।

"কি হয়েছে ওর?" তিনি তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করলেন।

"কমরেড, চিন্তা করবেন না। ও ফিরে আসবে।" খুড়ো আমাকে বললেন। তারপর তিনি তার স্ত্রীর দিকে ঘুরে বললেন, "যাও রান্না বসাও। এই দেখো দুটো জ্যান্ত মাছ এনেছি!"

তার স্বামীর এই হাল্কা মেজাজ দেখে ভদ্রমহিলা স্বস্তি পেলেন। তিনি তার সেলাই করা কাঁথাটা ইটের বেদীতে রেখে রান্না করতে বাইরে বেড়িয়ে গেলেন। খুড়ো প্রদীপের আলোয় তার পাইপ ধরিয়ে আমার দিকে ঘুরে বললেন, "কমরেড, আপনি এখানে বিশ্রাম করুন। আমি গ্রাম প্রধানের সাথে দেখা করে আসি।"

আমি ঘরে একা বসে রইলাম। ইটের বেদীতে বসে আমি পেট গরম করার লাল কাঁথাটা তুলে নিলাম। সেই হাতাহীন ছোট্ট সাদা জ্যাকেটটার কথা চিন্তা ক'রে আমার মন ভারাক্রান্ত হয়ে রইল।

হঠাৎ শব্দ করে দরজাটা খুলে গেল। আমি ভাবলাম খুড়ো ফিরে এসেছেন। কিন্তু ঘুরে দেখি একটি দুষ্টু ছেলের উজ্জ্বল মুখ।

"ওঃ! খোকন!" আমি প্রায় চিৎকার করে উঠলাম।

"কাকু!" এই বলে সে ঘরে লাফিয়ে ঢুকল।

আমি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। সে আমার গলা জড়িয়ে ধরে, চোখ পিটপিট করে জিজ্ঞেস করল, "কাকু তুমি কি খুব ভয় পেয়েছিলে?"

আমি বললাম, "নিশ্চয়ই। আমি ভেবেছিলাম ওরা তোমাকে শেষ করে দিয়েছে।"

খুদে ছোকরা ওর মাথা তুলল। ওর কানটা আমার বুকের মধ্যে চেপে ধরল। তারপর হাততালি দিতে দিতে চিৎকার করে বলল, "তাই তো, তোমার বুক যে এখনও ধরফর করছে!"

আমি ওর ঐ সপ্রতিভ বড় বড় চোখ দুটোর দিকে তাকালাম। ভীষণ প্রাণোচ্ছল ছেলে। আমি ওকে বেদীতে তুলে নিলাম। ওর হাতাহীন জ্যাকেটটা নেই। ওর মাছ ধরার বাক্সটাও নেই, আর ওর প্যান্টটা হাঁটু অবধি গোটানো। সমস্ত শরীর থেকে জল চুইয়ে পড়ছে। দেখে মনে হচ্ছে একটা বাচ্চা হাঁস যেন এই মাত্র জল থেকে উঠে এল।

আমি বললাম, "তুমি কি ভাবে ফিরে এলে, বলতো?" দুষ্টুমিভরা চোখে ছেলেটি উত্তর দিল, "আমি প্রথমে আমার মাছ ধরার বাক্সটাকে মাটি ভর্তি করলাম। তারপর সেটার ওপরে আমার সাদা জ্যাকেটটা চাপিয়ে দিয়ে নদীতে ছুঁড়ে দিলাম। ফলে একটা ঝপাৎ করে শব্দ হল। শত্রু সৈন্যেরা আমার সাদা জ্যাকেটটা দেখে সচকিত হয়ে চিৎকার করে বলল, 'একজন অষ্টম বাহিনীর সৈন্য পালাচ্ছে!' ওরা ঐ বাক্সটার পিছু ধরে নদীর তীর বেয়ে দৌড়তে লাগল এবং সেটার দিকে গুলি ছুঁড়ে চিৎকার করে বলতে লাগল, 'ওকে জ্যান্ত ধর!' ওরা অনেকটা দূরে চলে না যাওয়া পর্যন্ত আমি নলখাগড়ার মধ্যেই লুকিয়ে ছিলাম। তারপর এক দৌড়ে বাড়ি চলে এলাম।"

আমি না হেসে পারলাম না। খুড়িও খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। তিনিও তার ছোট ছেলের গল্প শুনে হাসতে আরম্ভ করলেন। কেবল ছোট ছেলেটাই হাসল না, বরং তার চোখ দু'টা বড় বড় করে সে বলল, "হু। যদি আমার একটা মেশিনগান থাকত না, আমি ওদের গুলি করে নদীতে ফেলে দিতাম। আর কচ্ছপেরা পেট ভরে ওদের খেতে পারত।"

"তোমার নাম কি খোকা?" আমি তাকে প্রশ্ন করলাম।

সে তার ঘাড় কাত করে নাম বলার পরিবর্তে আমায় প্রশ্ন করল, "তোমার নাম কি?"

আমি যখন বললাম যে আমার পদবী হচ্ছে মা (ঘোড়া), সে তার হাত দুটোকে মাথার উপর তুলে শিং-এর মতো করে ধরল। তার মুখটা ফাঁক করে একটা বাছুরের মতো ডেকে উঠল। তারপর সে তার দুহাতে আমার গলা

জড়িয়ে ধরে, আদর খাওয়া বাছুরের মতো ওর মাথা দিয়ে আমার গালে চাপ দিয়ে বলল, "তাহ'লে তুমি হলে ঘোড়া। বেশ, আর আমি হলাম ষাঁড়। অর্থাৎ আমাদের দুজনের মধ্যে কিছু কিছু মিল আছে।"

খুড়ি তার পিঠে আদর করে চাপড় মেরে বললেন, "দুষ্টুমি করে না। কমরেডকে খেতে দে।" তারপর তিনি হাসতে হাসতে বললেন, "আমাদের পারিবারিক নাম হচ্ছে লি। খুদে ষাঁড়টার এখনও কোন নাম দেওয়া হয় নি, তাই ওকে শুধু খুদে ষাঁড় বলেই ডাকবেন।"

দরজার বাইরে দ্রুত পায়ের শব্দ শোনা গেল। খুড়ো ও তার সাথে কিছু গ্রামের কর্মী ঘরে এসে ঢুকলেন। কারা এসেছেন দেখেই খুদে ষাঁড় বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠল। খুড়ি ওকে যে কেকটা দিয়েছেন সেটা তুলে নিয়েই বাইরে প্রহরী হয়ে সে দাঁড়িয়ে গেল। আর সঙ্গে নিল লাল ফিতে বাঁধা একটা বর্শা।

পরের দিন খুদে ষাঁড় ভোর হবার সাথে সাথেই উঠে আমার ঘরের মধ্যে উঁকি মারল। আমাকে জেগে থাকতে দেখেই একলাফে আমার ঘরে ঢুকে পড়ল।

ও আমাকে স্বাগত জানাল, "আরে তুমি দেখছি জেগে আছ।" তারপর সে আমার কানে কানে বলল, "তুমি এখানে অপেক্ষা কর। আমি হ্যামো ডোবা থেকে তোমাকে একটা জিনিস এনে দেব।"

"হ্যামো ডোবা?"

"হু। ওটা কাদা ভরা ডোবা। কোন অচেনা লোক একবার ওর ভেতরে ঢুকলে আর বেরোতে পারবে না।"

ছোট ছেলেটি ঘুরে লম্বা লম্বা পা ফেলে গেটের কাছে গেল। সেখানে সে মাথায় কিছু নলখাগড়া লাগিয়ে নিল, যেন সে ছদ্মবেশ ধারণ করেছে। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে, মাটির উপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। চৌকাঠে একটা হাত দিয়ে এবং মেশিনগান চালানোর মতো ভঙ্গী করে, সে চিৎকার করে উঠল, "ক্র্যাক……।" তারপর কাদামাটির "হাত গ্রেনেড" ছুঁড়ে চিৎকার করে বলতে লাগল, "জাপানী আগ্রাসীদের খতম কর! খতম কর!" উঠোনের হাঁসেরা ভয় পেয়ে চিৎকার করতে করতে এদিক ওদিক ছুটতে আরম্ভ করল।

খুড়ি ছুটে তার ঘর থেকে বেড়িয়ে এসে খুদে ষাঁড়টার মাথায় আদর করে চাপড় দিয়ে বলল, "শান্ত হ! তুই দেখছি কমরেডকে জাগিয়ে দিবি।"

খুদে ষাঁড় দাঁড়িয়ে খুড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, "কমরেড মা আগেই উঠে

পড়েছেন।" এই কথা বলে, ঘুরে সে দৌড়ে বেরিয়ে গেল। আর তখনই গ্রাম প্রধান ভিতরে আসছিলেন, সে তার গায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

"এ কিরে! এ কোন বাছুর রে, আমায় গুঁতোচ্ছে?" গ্রাম প্রধান পরিহাস করে বললেন। খুদে ষাঁড় মুখ ভেঙিয়ে তার হাতের ফাঁক দিয়ে বেড়িয়ে গেল। হাঁসগুলো তার পেছনে ডানা ঝাপটাতে লাগল।

ছুটন্ত খুদে ষাঁড়ের দিকে তাকিয়ে আমি গ্রাম প্রধানকে বললাম, "সত্যিই, কি চালাক ছেলে!"

গ্রাম প্রধান তার পাইপ ধরিয়ে বললেন, "ঠিক কথা। ও আমাদের গণফৌজের 'অভিজ্ঞ সংবাদ বাহক'।"

আগের রাতে আক্রমণের যে পরিকল্পনার কথা আমরা আলোচনা করেছিলাম সেটা নিয়ে আমি ও গ্রামের প্রধান পুনরায় সতর্কতার সাথে কিছুটা পরামর্শ করে নিলাম। এবং আমরা সিদ্ধান্ত করলাম যে আমরা বিকেলের দিকে নদীর অপর পারে কোন একজনকে একটা নৌকা দিয়ে ফেরিঘাটে পাঠাব যাতে করে লিয়েনহুয়া থেকে বন্দুক নিয়ে ফিরে আসা শত্রুকে "স্বাগত" জানান যায়। আমরা ওদের প্রলোভিত করে হ্যামো ডোবায় নিয়ে যাবো। কিন্তু কে যাবে? গ্রামের প্রধান যখন খুদে ষাঁড়ের নাম প্রস্তাব করলেন, আমি একটু চিন্তা করে মত দিলাম। আমি বললাম, "খুদে ষাঁড় সতর্ক, সাহসী ও বুদ্ধিদীপ্ত এবং একটি শিশুকে ওরা সন্দেহও করবে না। তাছাড়া, ও যেহেতু প্রায়ই হ্যামো ডোবায় হাঁস চড়াতে যায়, ও ওখানকার জলপথটা চেনেও ভালো। আর তাছাড়া ও নৌকো চালাতেও জানে।"

গ্রামের প্রধান হাসলেন। "উপরন্তু ও যে কেবল প্রহরীর কাজই করে তাই নয়, ও ঘুরে ঘুরে খবরও সংগ্রহ করে। আমাদের বড়দের সাথে গিয়ে ও অনেক সময় লড়াইও করেছে। যদিও বয়সে ও এখনও ছোট ওর লড়াই-এর অভিজ্ঞতা খুব কম নয়।" যাই হোক, এইভাবে পরিকল্পনা মাফিক ব্যাপারটার একটা সমাধান করা হল।

দুপুরের খাবার সময় খুদে ষাঁড় বেশ মেজাজে লাফিয়ে এসে ঘরে ঢোকে এবং মাটির হাঁড়িতে ধপ করে কি যেন একটা ছুড়ে দেয়। "এই নাও, একটা কচ্ছপ নিয়ে এসেছি—ঝোল রান্না কর।" বোঝা গেল আমার জন্যে হ্যামো ডোবা থেকে এটাই ও আনবে বলেছিল!

তারপর সে আমাদের দুজনকে বলল, "ওখানে কি দেখলাম জান? হ্যামো



পৃষ্ঠা—১৯

ডোবায় হাঁস চরাতে গিয়ে দেখি লেকের মধ্যে বেশ কিছুটা দূরে কয়েকজন ভাড়াটে সৈন্য আসছে। আমি জানি ওরা কোন কাজের নয়। আমি হাঁসগুলোকে নলখাগড়ার মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়ে নিঃশব্দে নলখাগড়ার জলা পার হয়ে যাই এবং ওদের দেখতে থাকি। বেশ কয়েকজন ভাড়াটে সৈন্য ও জাপানী মিলে লেকের মধ্যে কি যেন খোঁজাখুঁজি করছে। একজন কুঁজো, ট্যারা, ঘাড়-লম্বা লোক গর্জন করে বলে উঠল, 'একটা নৌকোও দেখা যাচ্ছে না।' অন্য একজন সূর্যের দিকে নীরসভাবে তাকিয়ে বলল, 'কি বিচ্ছিরি গরম, অথচ আরও অনেকটা পথ যেতে হবে। কপাল খারাপ!' ওরা কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর লিয়েনহুয়া শহরের দিকে যাত্রা করল। ওঃ যদি আমার একটা মেশিনগান থাকত না, তবে ওদের যাওয়া দেখিয়ে দিতাম!"

রাগে খুদে ষাঁড়ের মুখ লাল হয়ে গেল। সেই সময় খুড়ো এসে বললেন যে ঐ ট্যারা লোকটা একটা সত্যিকারের বদমাস। টুটিমিয়াওর বড় জমিদার কুওর দ্বিতীয় পুত্র। সে একটি বিশ্বাসঘাতক দলের খুদে অফিসার ছিল।

পাইপের ভেতরে তামাক চেপে ঢুকিয়ে গ্রামের প্রধান ধুঁয়ো টানলেন তারপর আমাকে বললেন, "ওরাই সেই শত্রু যারা মেশিনগান আনতে লিয়েনহুয়ায় যাচ্ছে।"

"মেশিনগান?" খুদে ষাঁড় ওর কান খাড়া করল। সে তার হাত মুঠো করে বলল, "আমি আগে গিয়ে মেশিনগানটা নেব!"

খুড়ি বললেন, "যা তো, নিজের খাবার খেতে যা। বড়রা আলোচনা করছে—তোর এখানে কোন দরকার নেই।" তিনি খুদে ষাঁড়কে মাছের ঝোলের একটা থালা দিয়ে আমাকে বললেন, "শুধু কি তাই, স্বপ্নের মধ্যেও ও মেশিনগান চায়।"

গ্রাম প্রধান আরাম করে পাইপ টানতে টানতে আমাকে বললেন, "যা হোক, আমার মনে হয় আজকের কাজের জন্যে খুদে ষাঁড়ই সবচেয়ে সঠিক হবে।"

মধ্যাহ্ন ভোজের পর সশস্ত্র গণফৌজ ছোট ছোট নৌকায় হ্যাংমো ডোবার দিকে যাত্রা করল। তারা নলখাগড়ার মধ্যে আত্মগোপন করল। খুদে ষাঁড় একটা নৌকো নিয়ে বিলের প্রশস্ত জলাধারের মধ্যে দিয়ে যেতে লাগল। এবং আমাদের পরিকল্পনা মাফিক পূর্ব তীরের দিকে যাত্রা করল।

তখন বেলা প্রায় দুটো। সূর্য মাথার উপরে উঠেছে এবং মাটিও তেতে গেছে। মাটিতে পা ফেললেই সাদা ধুলোর মেঘ ওড়ে। একদম নতুন একটা

মেশিনগান নিয়ে একজন জাপানী এল। তাকে গার্ড দিয়ে রেখেছে বন্দুক হাতে ছ' জন ভাড়াটে সেনা—দুজন সামনে চারজন পেছনে। ওরা সাতজনই ঘামছে এবং হাঁফাচ্ছে। ওরা মুখ নীচু করে হাঁটছে। জাপানীটা ঘুরে একজন ভাড়াটে সৈন্যের কাঁধে মেশিনগানটা দিয়ে ওর পিঠ চাপড়ে বলল, "তুমি আমার এই মেশিনগানটা নাও।" ভাড়াটে সৈন্যটা কেবল চোখ পিটপিট করল মাত্র এবং মুখ বুজে বোঝা বইতে লাগল। ওরা যখন বিলের ধারে পৌছল, তখন ওদের আর এক ইঞ্চিও নড়বার ক্ষমতা নেই। মনে হল যেন ওদের পা বালির বস্তার সাথে বাঁধা। ওরা মাটিতে বসে ঘাড় উঁচু করে দেখতে লাগল বিলে কোন নৌকা আছে কিনা।

ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে গেল। খুদে ষাঁড় একটা ছেঁড়া খড়ের টুপী মাথায় দিয়ে একঝাঁক হাঁস চড়াতে চড়াতে তার ছোট্ট নৌকাটা ফেরিঘাটের দিকে বেয়ে নিয়ে যেতে লাগল। হাঁসের ডাক নকল করে সে জোরে ডেকে উঠল, "কোয়াক! কোয়াক!"

ভাড়াটে পুতুল সৈন্য তাকে দূরে দেখে চিৎকার করে উঠল, "এই—এই খোকা—শোন!"

"কি বলছ—?" খুদে ষাঁড় চিৎকার করে উত্তর দিল। আর ইচ্ছাকৃতভাবে তার নৌকাটা আরও দূরে নিয়ে যেতে লাগল।

ট্যারা লোকটা তির্যক দৃষ্টি হানল এবং চোয়াল শক্ত করে বলল, "এই ভর-দুপুরে একটা নৌকা আসা ভাল লক্ষণ নয়। আর আমরা যখন বন্দুক নিয়ে এলাম ঠিক তখনই নৌকাটা এল—এরই বা মানে কি? আমাদের মেশিন-গানের জন্যেই কি এটা এল?"

জাপানীটা মাথা নেড়ে বলল, "আরে না না, ঐ নৌকা আমাদের কিছু করতে পারবে না। অষ্টম রুট বাহিনী খুবই সেয়ানা।"

সূর্যের তাপ ক্রমশই বাড়ছে। একজন ভাড়াটে সৈন্য অভিযোগ করল, "চুলোয় যাক! যদি আবার ঐ রাস্তা দিয়ে ফিরে যেতে হয় তাহলে আমার শরীর রোষ্ট হয়ে যাবে।"

আরেকজন ভাড়াটে সৈন্যরও তাই মনে হল। ট্যারা লোকটার দিকে তাকিয়ে সে বলল, "স্যার, একটা বাচ্চা ছেলে তো মাত্র নৌকো বাইছে। এতে ভয় পাবার কি আছে?"

ট্যারা লোকটা বিলটার দিকে ভালভাবে চোখ বোলাল। দেখে মনে হল ছেলেটি একাই। "চল দেখি", সে বলল।

ভাড়াটে সৈন্যরা, যারা এতক্ষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, উৎসাহভরে ম্যাজিকের মতো উঠে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে খুদে ষাঁড়কে চিৎকার করে ডাকতে লাগল, "খোকা চলে যাস নে। এদিকে আয়!"

খুদে ষাঁড় ধীরে ধীরে তীরের দিকে নৌকা বেয়ে আসতে লাগল।

জাপানী নকল হাসি হেসে তার কাছে গিয়ে বলল, "খোকা বলত বিলে অষ্টম রুট বাহিনী আছে?"

খুদে ষাঁড় না বোঝার মতো করে মাথা নাড়ল।

ট্যারা লোকটা চারিদিক দেখে নিজের কোমর থেকে বেয়নেট বার করে খুদে ষাঁড়ের বুকের কাছে ধরে বলল, "তুই শয়তান অষ্টম রুট বাহিনীর ছেলে! সত্যি কথা বল, নয়ত আমি তোকে শেষ করে ফেলব!"

খুদে ষাঁড় চিৎকার করে কেঁদে ফেলল। তারপর চোখের জল ফেলে বলতে লাগল, "বিলে নলখাগড়া ছাড়া আর কিচ্ছু নেই। অষ্টম রুট বাহিনী আবার কি?" সে নাক দিয়ে শিকনি টানতে টানতে দু হাত দিয়ে চোখ কচলাতে লাগল।

ট্যারা লোকটা ভাবল, ও নিছকই একটি বোকা ছেলে। তাই সে ব্যাপারটা নিয়ে আর বেশীদূর এগোল না।

ট্যারা লোকটা জাপানীটার দিকে চেয়ে বলল, "স্যার, একটা ছোট রাস্তা দিয়ে গেলে কেমন হয়? একে তো দেরী হয়ে গেছে এখন যদি অষ্টম রুট বাহিনী এসে পড়ে তো খারাপ হবে। আমি শুনেছি, লিয়েনহুয়া শহরে আজ একটা রাজার সৈন্যবাহিনী টুটিমিয়াও যাবার পথে মাটিতে পাতা মাইনের মধ্যে পড়েছে।"

জাপানীটা ভয়ে আঁতকে উঠল, যেন সে ইলেকট্রিক তারে পা দিয়েছে। তারপর সম্মতি দিল। সৈন্যরা সব লাফিয়ে নৌকায় গিয়ে উঠল।

ট্যারা লোকটা দাঁত করমর করে বলল, "এই ছেলেটা, আমাদের বিলের ঐ পাড়ে নিয়ে চল। তোকে অনেক বকশিশ দেব। এ্যা?"

খুদে ষাঁড় চিন্তিতভাবে তাকিয়ে বলল, "না। আমি পারব না। আমার হাঁস চড়াতে হবে।" সে তার টুপী খুলে তার ওপর বসে তার দাঁড়টাকে নাড়তে লাগল। তাতে হাঁসের ঝাঁক ডাকতে ডাকতে তীরে উঠে গেল।

সৈন্যরা রেগে আগুন। ট্যারা লোকটা খুদে ষাঁড়ের কাছে গিয়ে তাকে এক লাথি মেরে গালাগাল দিয়ে বলে উঠল, "অপদার্থ! নৌকা চালা।" কেবল তখনই খুদে ষাঁড় গম্ভীর মুখ করে নৌকায় লাফিয়ে উঠে নৌকো চালিয়ে নিয়ে যেতে লাগল।

লেকের মধ্যে বাতাস অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা। ভাড়াটে সৈন্যরা জামার বোতাম খুলে শরীর ঠাণ্ডা করছে আর নোংরা গান গাইছে। চকচকে মেশিনগানের দিকে তাকিয়ে এবং এই শয়তানেরা কি রকম আরাম ভোগ করছে তা দেখে খুদে ষাঁড় মনে মনে বলল, "হু! দাঁড়াও না, তোমাদের সময় হয়ে এসেছে!"

প্রশস্ত লেকের মাঝখান দিয়ে গিয়ে, খুদে ষাঁড় নৌকাটাকে একটা সরু জলপথ দিয়ে নিয়ে যেতে লাগল। দু দিকের নলখাগড়াগুলো ক্রমশ বড় হয়ে উঠছে। সরু জলপথে কয়েক পাক ঘোরার পর শত্রু সৈন্যরা সম্পূর্ণরূপে থেই হারিয়ে ফেলে, আর নলখাগড়াগুলো তাদেরকে যেন সাগরের মতো ঘিরে ফেলে। নলখাগড়ার উপর দিয়ে বাতাস বয়ে যায় তার সাথে নৌকার ধাক্কায় ওগুলো এমনভাবে নড়াচড়া করে যে লুকিয়ে থাকা সৈন্যরা বুঝতে পারে শত্রুরা কোথায় আছে। শত্রুরা ভয় পেয়ে যায়। জাপানী তার মেশিনগানটাকে ধরে বিড়বিড় করে বলে ওঠে, "বিপজ্জনক! খুবই বিপজ্জনক! ভাড়াটে সৈন্যরা খুদে ষাঁড়ের দিকে চেয়ে চিৎকার করে বলে, "তুই কি আমাদের কানাপথে নিয়ে যাচ্ছিস?"

জাপানীটা হঠাৎ মেশিনগানটা খুদে ষাঁড়ের দিকে উঁচিয়ে চাপা স্বরে বলে উঠল, "তোর কোন বুদ্ধি নেই। তোকে গুলি করে মেরে ফেলব।"

খুদে ষাঁড় তার দিকে ঘৃণার চোখে তাকাল এবং তার দাঁড়টা বুকের সংগে শক্ত করে ধরল। অবশেষে সে বলল, "হ্যামো জলাজমিতে যাবার এটাই একমাত্র পথ। আমি যদি তোমাদের এই পথ দিয়ে না নিয়ে যাই তবে তোমরা কি করে টুটিময়াওতে যাবে? তাহলে বল, আমি তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাই?"

সৈন্যরা আকাশে সূর্যের অবস্থান দেখে বুঝল যে অনেক দেরী হয়ে গেছে। তারা এই ভেবে ভয় পেল যে পথে যদি রাত্রি নেমে আসে তবে হয়ত শত্রুরা অতর্কিতে আক্রমণ করতে পারে। জাপানীটা আর কোন পথ খুঁজে না পেয়ে খিঁচিয়ে উঠল, 'চল্ চল্। তাড়াতাড়ি কর খোকা, তাড়াতাড়ি কর।"

নৌকা চলতে শুরু করল। ক্রমশ মানুষের চেয়েও লম্বা লম্বা নলখাগড়া দু পারে আসতে লাগল এবং পথ ক্রমশ সরু হতে লাগল। তারা অবশেষে হ্যামো ডোবায় এসে পৌঁছল। সেখানে শুধু যে নলখাগড়াগুলো আরও বেশী লম্বা তা নয়, সেখানকার জলও অগভীর এবং কাদা ভরা। সতর্কভয়ে চারিদিকে তাকিয়ে খুদে ষাঁড় চিৎকার করে উঠল, "কোয়াক! কোয়াক। কোয়াক!"

হঠাৎ "কোয়াক! কোয়াক! কোয়াক!" শব্দের প্রতিধ্বনি উঠল

জলাজমির চারিদিককার নলখাগড়ার ভেতর থেকে। আর শত্রুকে হতচকিত করে চারিদিক থেকে অসংখ্য ছোট ছোট নৌকা তাদের দিকে আসতে আরম্ভ করল। কি ঘটছে বোঝার আগেই চারিদিকে বন্দুকের শব্দ শোনা যেতে লাগল। জাপানীটা মেশিনগানটা তুলতে গিয়েই দেখে খুদে ষাঁড় ইতিমধ্যেই সেটা দখল করে নিয়েছে।

"একদম নড়বে না! মাথায় উপর হাত তোল!" খুদে ষাঁড় মেশিনগানটা জাপানীদের দিকে তাক করে আদেশ দিল। ওরা ও ভাড়াটে সৈন্যরা বাধ্য ছেলের মতো মাথার উপরে হাত তুলল।

সূর্যাস্তের গোলাপী রঙ লেকের মধ্যে প্রতিফলিত হচ্ছে। আনন্দের কলোচ্ছ্বাসে হ্যামো ডোবা প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল। আনকোরা নতুন মেশিনগান হাতে নিয়ে খুদে ষাঁড় এক নৌকা থেকে আর এক নৌকায় লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে লাগল, আর চিৎকার করে বলতে লাগল, "মেশিনগান! মেশিনগান! আমরা একটা গান পেয়েছি!"

নিজেদের বিজয়ে হর্ষধ্বনি করতে করতে গণফৌজ সিয়াওলু চুয়াং এর দিকে নৌকা বেয়ে নিয়ে যেতে আরম্ভ করল। একটা নৌকায় গ্রাম প্রধান আমার সাথে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমরা তাদের হর্ষধ্বনি শুনছিলাম। তিনি খুশীর সাথে আমাকে বললেন, "কমরেড মা, এবার খুদে ষাঁড় একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করেছে। আমরা জাপানী আগ্রাসীদের দেখিয়ে দিয়েছি যে আমাদের শিশুরাও তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে। আমাদের উপরে কর্তৃত্ব করার দিন তাদের শেষ হয়ে আসছে।"

আমি বললাম, "ঠিক কথা। চেয়ারম্যান মাও আমাদের বলেছেন, 'যদি সমগ্র দেশের সাধারণ মানুষকে সক্রিয় করা যায় তবে এমন বিশাল এক সাগরের উদ্ভব হবে যাতে শত্রু ডুবে যাবে। এই কথাটা দৃঢ় সত্য।"



বানর শ্বেত-অস্থি দানবীকে দমন করলেন



উ চেং-এন

বৌদ্ধধর্মের পুঁথি সংগ্রহ করার জন্য সন্ন্যাসী হ্যুয়ান-স্যাং তাঁর তিন শিষ্য বানর, পিগসি ও স্যানডির দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পশ্চিমের দিকে যাত্রা করছিলেন। সেই যাত্রা খুবই কষ্টকর হবে ভেবে বানরকে পথ পরিচালক করে নেওয়া হয়েছিল।

দুর্গম পথ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ আকাশটা কালো মেঘে ছেয়ে গেল। আর তখনই তারা সামনে অনেকগুলো সুউচ্চ অশুভ পাহাড়ের সারি দেখতে পেলেন। বানর সেই পাহাড়গুলো দেখে সকলকে সাবধান করে দিয়ে বললেন, "বন্ধুগণ আপনারা সকলে সাবধান হোন। আমার আশংকা নিশ্চয়ই আশেপাশে কিছু দানব আছে!"

সেই-কথা শুনে হ্যুয়ান-স্যাং এত ভয় পেয়ে গেলেন যে তিনি আর ঠিক মতো ঘোড়ার পিঠে বসতে পারলেন না। বানর তাঁকে নামতে সাহায্য করে বললেন, "শান্ত হোন, প্রভু! পথে আপনার যে দানবই আসুক না কেন, আমি যতক্ষণ আছি, আমি সকলকে খতম করে ফেলব।" হ্যুয়ান-স্যাং তাঁকে ধমক দিয়ে দিয়ে বললেন যে বৌদ্ধধর্মে হত্যা করা পাপ।

ঠিক সেই মুহূর্তেই একটি কালো মেঘ তাদের মাথার উপর দিয়ে ভেসে গেল, বানরও চকিতে তৎপর হয়ে উঠলেন। কিন্তু যেই তিনি আকাশে লাফ দিয়ে মেঘটাকে কাছের থেকে দেখতে গেলেন, কালো মেঘের টুকরোটাও একটা পাহাড়ের চূড়ার পেছনে মিলিয়ে গেল। পিগসি বানরকে ঠাট্টা করে বলে উঠলেন, "ভাই হে, তুমি দেখছি খুবই সন্দেহ-বাতিকগ্রস্ত লোক।" তারপর তিনি তাঁর পেটে হাত বুলিয়ে বললেন, "চলো আমরা এগিয়ে যাই। দেখি কিছু খাবার পাওয়া যায় কিনা।" কিন্তু বানর খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। তিনি বললেন, "এটা একটা নির্জন পাহাড় এবং মাইলখানেকের মধ্যে কোন

জনমানুষের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আমি বরং এগিয়ে গিয়ে দেখে আসি তোমাদের জন্যে কোন খাবার পাওয়া যায় কি না।"

বানর তাঁর সোনার কারুকার্য করা মুগুরটা দিয়ে তিনজনকে ঘিরে মাটির উপর একটি গণ্ডি কেটে দিয়ে বললেন যে তাঁরা যেন সেই গণ্ডির ভেতরেই থাকেন। এবং তাঁর অবর্তমানে তারা যেন কারো সাথে কথাবার্তা না বলেন, বা কোন কিছু না খান।

বানর চলে যাবার সাথে সাথেই সেই কালো মেঘের পুনরাবির্ভাব ঘটল। মেঘটি তিনজনের মাথার উপরে এসে থমকে গেল। সেই মেঘে চড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সেই পাহাড়ের নেকড়ে দানব।

এই পাহাড়েই শ্বেত-অস্থি দানবীর বাস। তার নির্দেশাধীনে, সিংহ, বাঘ, ভালুক ও নেকড়ে প্রভৃতি অনেক মানুষখেকো দানব বাস করে। নেকড়ে দানব যখন তার আবিষ্কারের খবর নিয়ে তাদের গুহায় ফিরে এল, অন্যান্য দানব ও প্রেতাত্মারা হ্যুয়ান-হ্যাং ও তাঁর শিষ্যদের বন্দী করার অনুমতি পাবার জন্য দানবীর কাছে চিৎকার করে আবেদন জানাতে আরম্ভ করল।

সিংহ রাজা আর বিলম্ব না করে তার খাপ থেকে তলোয়ারটা বার করে নিল এবং অন্যান্য সব ভয়ংকর প্রেতাত্মাদের নিয়ে যেতে উদ্যত হল। তখন শ্বেত-অস্থি দানবী মৃদু হেসে বলল, "তুমি কি জানো না যে সন্ন্যাসী হ্যুয়ান-হ্যাং-এর বানর নামে একজন শিষ্য আছে?" বানরের নাম শুনে ভয়ংকর প্রেতাত্মাদের মুখ ভয়ে শুকিয়ে গেল, কিন্তু শ্বেত-অস্থি দানবী ঠোঁট উল্টে বলল, "ভয় পাবার কিছু নেই। ওকে কব্জা করার রাস্তা আমার জানা আছে।" এই কথা বলে শ্বেত-অস্থি দানবী বেরিয়ে এল এবং দেখল যে হ্যুয়ান-হ্যাং, পিগসি ও স্যানডি গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে বসে আছেন। আর তাদের ধারে কাছেও বানরের দেখা নেই।

নিজের ভাগ্যদেবীকে ধন্যবাদ জানিয়ে শ্বেত-অস্থি দানবী যেই হ্যুয়ান-হ্যাং-এর উপর ঝাঁপিয়ে পরতে যাবে, অমনি মাটির উপরে বানরের কাটা গণ্ডি থেকে সোনালী রশ্মি বের হতে আরম্ভ করল। ফলে দানবীর পক্ষে সেই গণ্ডির ভেতরে ঢোকা অসম্ভব হয়ে উঠল। দানবী চিন্তা করল, "বানর আত্মরক্ষা করতে জানে। কিন্তু আমি যদি অন্য রূপ ধারণ করি, তারা কি তখন আমার ফাঁদে পা দেবে না?" সেই চিন্তা করতে করতে সে একটি পাহাড়ের পেছনে লুকিয়ে পড়ল।

চোখের নিমেষে সেই পাহাড়ের পেছন থেকে একটি মাথায় ফুল গোঁজা কুমারী মেয়ে বেড়িয়ে এল। তার ঝুঁড়তে রয়েছে গরম বান রুটি। মুখে মিষ্টি হাসি হেসে এবং বুদ্ধের বাণী আবৃত্তি করতে করতে সে হ্যুয়ান-স্যাং ও তাঁর দুই শিষ্যের সামনে এসে হাজির হল।

পিগসি এত ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছিলেন যে তিনি স্থির হয়ে বসতে পারছিলেন না। বুদ্ধের বাণী শুনে এবং ধূমায়মান বান রুটির গন্ধ পেয়ে তিনি তাড়াতাড়ি চোখ খুললেন এবং খাদ্যের আশায় আনন্দে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি বানরের সাবধান বাণীর কথা উপেক্ষা করে সেই গণ্ডীর বাইরে বেরিয়ে এলেন এবং নত হয়ে সেই বালিকাটিকে অভিবাদন জানালেন। বালিকাটি ঈষৎ চিৎকার করে উঠল, মনে হ'ল যেন ভয় পেয়েছে, এবং তারপরই ছুটে পালাল। পিগসিও তার পেছনে ছুটতে ছুটতে চিৎকার করে বলতে লাগলেন, "তুমি ভয় পাচ্ছ কেন? আমি পূর্বের ট্যাং অঞ্চলের একজন সন্ন্যাসী" ঝোলাটা ঝুলিয়ে. বোকার মতো হেসে মেয়েটি বলল, "আমার উপর রাগ করবেন না, মহামান্য সন্ন্যাসী। আমার এত সন্দেহগ্রস্ত হওয়া উচিত হয়নি।"

"তোমার কোন দোষ নেই। কিন্তু আমার বড় ভাই বানর যদি তোমাকে এই পাহাড়ে দেখতেন, তাহলে তিনি তোমাকে একজন দানবী বলেই মনে করতেন," পিগসি মেয়েটিকে বললেন। মেয়েটি পিগসিকে বলল যে সে পশ্চিমের কোন একস্থানে বাস করে, তার বাবা-মা বৌদ্ধ এবং তারাই তাকে স্বর্গীয় রাজার মন্দিরে পূজো দেবার জন্যে পাঠিয়েছেন। তাকে সংগে করে মন্দিরে নিয়ে যাবার জন্য পিগসি মেয়েটিকে অনুরোধ করলেন। সে কথা শুনে হ্যুয়ান-স্যাং তাকে যেতে দিতে আপত্তি করলেন। বিশেষ করে বানর না আসা পর্যন্ত যেন স্যানডি ও পিগসি অবশ্যই অপেক্ষা করেন।

মেয়েটি পিগসির দিকে তাকিয়ে চোখের ইসারা করল এবং চলতে শুরু করল। পিগসি তাড়াহুড়ো করে হ্যুয়ান-স্যাংকে গণ্ডী থেকে টেনে বার করে উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করে বললেন, "খুকু দাঁড়াও, আমরাও তোমার সাথে যাবো!"

স্যানডি ছুটে গিয়ে মেয়েটিকে সরাসরি প্রশ্ন করলেন সে কে। "প্রভু" বলে চিৎকার করে মেয়েটি চকিতে হ্যুয়ান-স্যাং-এর পিছনে গিয়ে লুকোল। তাঁর খারাপ ব্যবহারের জন্য হ্যুয়ান-স্যাং স্যানডিকে বকলেন। মেয়েটি তা শুনে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল। তারপর সে বলল, "সামনেই স্বর্গীয় রাজার মন্দির। মহামান্য সন্ন্যাসী আমায় অনুসরণ করুন।"

প্রভু ও শিষ্যদের নিয়ে মেয়েটি চলতে শুরু করেছে, হঠাৎ তারা উপর থেকে একটা চিৎকার শুনতে পেলেন, "শয়তানী দানবী!" আর তারপরই বানর লাফিয়ে এসে নামলেন। ফিরে এসে বানর দেখেছিলেন যে একটি মেয়ে তাঁর প্রভুর সংগে কথা বলছে। মেয়েটি যে একটি দানবী তা তিনি তখনই বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি ছুটে এসে মেয়েটিকে তাঁর মুগুর দিয়ে আঘাত করলেন।

শ্বেত-অস্থি দানবীর মেয়ে-রূপী শরীরটা নিষ্প্রাণ হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। আর তার আত্মা সেই শরীর থেকে বেড়িয়ে মেঘের শরীর ধারণ করে উড়ে গেল। বানরও তার পেছনে তাড়া করলেন।

মেয়েটিকে মরে যেতে দেখে হ্যুয়ান-স্যাং অত্যন্ত দুঃখ পেলেন এবং প্রতিবাদ করে বললেন যে হত্যা করা পাপ। পিগসিও বানরকে গালাগাল করলেন। কেবল স্যানডি বানরের পক্ষ নিয়ে বললেন যে বানর দানবীর উপর কড়া নজর রেখেছে এবং সে কখনও নিরীহ মানুষকে হত্যা করবে না।

হ্যুয়ান-স্যাং ভাবতে লাগলেন মেয়েটি কে ছিল।

এমন সময় পাহাড়ের অপর দিক থেকে এক বৃদ্ধা মহিলা খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে এল। বৃদ্ধার হাতে রয়েছে একটি লাঠি ও জপমালা। আর সে বুদ্ধের বাণী আবৃত্তি করছে। এই বৃদ্ধা মহিলাটি শ্বেত-অস্থি দানবীর আর একটি ছদ্মরূপ। পিগসি ভয় পেয়ে চিৎকার করে বলে উঠলেন, "আমরা আবার ঝামেলায় পড়লাম। এই বৃদ্ধা মহিলাটি নিশ্চয়ই ঐ মেয়েটির মা, মেয়েকে খুঁজতে এসেছেন।"

বৃদ্ধা মহিলাটি কাছে এসে পিগসিকে জিজ্ঞেস করল যে, তিনি তার মেয়েকে দেখেছেন কি না। পিগসি অসহায়ভাবে হ্যুয়ান-স্যাং এর দিকে তাকালেন। আর হ্যুয়ান-স্যাং মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন, কিছু বলতে পারলেন না। বৃদ্ধা মহিলাটি দেখলেন যে তার মেয়ে মাটিতে পড়ে রয়েছে। পিগসির উত্তরের অপেক্ষা না করেই সে কান্নায় ভেঙে পড়ল। সে চিৎকার করে বলল, "হায় হতভাগী! বুদ্ধের ভক্তেরও এই করুণ পরিণতি হয়!" সে পিগসির জামার হাতা ধরে তাঁকে অভিসম্পাত দিতে লাগল।

সন্ন্যাসী গদগদ হয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করে বললেন, "আপনি ওকে দোষ দেবেন না মা। সমস্ত দোষ আমার আর এক শিষ্য বানরের। আমার উচিত ছিল তাকে আরও কড়া নজরে রাখা।"

মহিলাটি এই কথা শুনে পিগসিকে ছেড়ে দিল এবং একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে

বলল, "আমার মহামান্য সন্ন্যাসী সত্যিই সহৃদয়। ঈশ্বরের অপার মহিমা। সে সন্ন্যাসীকে তার সাথে কাছেরই একটি গ্রাম থেকে একটা শবাধার কিনতে যাবার জন্য অনুরোধ করল। এবং তিনিও অত্যন্ত স্বেচ্ছায় তার সাথে চললেন।

তারা যখন সরু পথ ধরে চলতে শুরু করেছেন, সেই সময়ে তারা একটা প্রকাণ্ড গাছের পেছন থেকে একটি অট্টহাসি শুনতে পেলেন। এবং চকিতে বানর তাঁর মুগুর দিয়ে মহিলাটিকে আক্রমণ করলেন। মহিলাটি পালাবার সুযোগ পর্যন্ত পেল না।

দানবী নিজেকে ধোঁয়ায় রূপান্তরিত করে পালিয়ে গেল। বানরও আবার তার পেছনে ধাওয়া করার জন্যে যেই প্রস্তুত হয়েছেন, অমনি হুয়ান-স্যাং তাঁকে থামিয়ে দিলেন। "তুমি কি পাগল হয়ে গেলে যে মা মেয়ে দুজনকেই মেরে ফেললে?"

বানর আবেদনের সুরে বললেন, "প্রভু, আপনি প্রবঞ্চিত হয়েছেন। ওরা মা ও মেয়ে নয়; ওরা একই দানবী, বিভিন্ন ছদ্মবেশ ধারণ করেছে। যেখানে কয়েক মাইলের মধ্যে কোন বাড়ি নেই সেখানে ঐ মেয়েটি এল কি করে? আপনি একটু চিন্তা করে দেখুন। আর একজন বৃদ্ধাই বা কিভাবে এই পাহাড়ী রাস্তা বেয়ে উঠে আসবে?"

বৃদ্ধা মহিলার জপমালাটা দুলিয়ে পিগসি বললেন, "সে নিশ্চয়ই একজন মানবী।" সন্ন্যাসী অত্যন্ত ক্রুদ্ধস্বরে বললেন, "সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে বৌদ্ধ ধর্মে হত্যা নিষিদ্ধ। আমি তোমাকে ক্ষমা করতে পারি কিন্তু ভগবান বুদ্ধ তোমাকে অবশ্যই শাস্তি দেবেন।"

এই কথা বলে হুয়ান-স্যাং বানরের উপরে জাদুমন্ত্র প্রয়োগ করতে আরম্ভ করলেন। তিনি আদেশ দিলেন, বানর যদি অবাধ্য হয় তবে তার মাথায় যেন খুব আঁটো একটি ধাতব বেড়ি পড়ে যায়। বানরের মাথায় সেই জাদু বেড়ি পড়ে গেল। অসহ্য যন্ত্রণায় বানর ছটফট করতে লাগলেন। বানরের সেই যন্ত্রণা দেখে স্যানডি বানরের পক্ষ থেকে ক্ষমা ভিক্ষা করলেন। তিনি বললেন, "প্রভু, আমাদের বড় ভাই বানর যদি তার জীবন বিপন্ন করে দানবীদের হাত থেকে আপনাকে রক্ষা না করতেন, তবে এতক্ষণে তারা আপনাকে খেয়ে ফেলত।"

স্যানডির আবেদন শুনে সন্ন্যাসী তাঁর জাদু প্রত্যাহার করলেন। বানর

স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেয়ে ভাবলেন এরপর কী করা যায়। যদি তিনি দানবীকে ছেড়ে দেন তবে হুয়েন-স্যাং কোন না কোন সময় তার ফাঁদে পড়বেনই। সুতরাং দানবীকে ছেড়ে দেওয়া চলে না। তাই তিনি পথ পরিক্রমা করতে যাচ্ছেন বলে, দানবীর খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন।

দু দুবার বেঁচে পালিয়ে এসে শ্বেত-অস্থি দানবী তার গুহায় ফিরে আসে। সে তার ধূমায়মান সিংহাসনে বসে ভাবতে থাকে কি করে বানরের মোকাবিলা করা যায়। একটু পরেই সে গুহা থেকে বেরিয়ে আসে। তার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। সে পথের কয়েকটি গাছকে একটি কুঁড়ে ঘরে রূপান্তরিত করে নেয় এবং নিজেকে একজন পক্ক-কেশ বৃদ্ধে পরিণত ক'রে সেই কুঁড়ে ঘরের পাশে বসে পড়ে।

বানর সেই বৃদ্ধ লোকটিকে দেখেই বুঝতে পারলেন যে এ সেই দানবীরই ছদ্মবেশ। বানর চিৎকার করে বলে উঠলেন, "শয়তানী, দানবী! তুই কি ভাবিস ছদ্মবেশ ধারণ করে আমাকে ঠকাতে পারবি?" তারপরই তিনি তাঁর মুগুর নিয়ে দানবীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

দানবী ভেবেছিল সন্ন্যাসী হুয়েন-স্যাং আসবে, পরিবর্তে এল বানর। বানর হঠাৎ তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ায় সে ভয় পেয়ে গেল এবং চকিতে উঠে পড়ে লাঠি নিয়ে বানরের সাথে লড়াই-এ নেমে পড়ল। বানরের আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে দানবীর অস্ত্র ক্রমেই অকেজো হয়ে পড়তে লাগল।

দানবী সেইসময় হঠাৎ দেখতে পেল যে হুয়েন-স্যাং ও অন্যান্যরা আসছে, তাই সে তাদের দিকে ছুটে গেল আর চিৎকার করে বলতে লাগল, "বাঁচাও! বাঁচাও!" সে সন্ন্যাসীর কাছে গিয়ে নতজানু হয়ে প্রাণ ভিক্ষা চাইল। বানরও সেখানে ছুটে এলেন এবং চূড়ান্ত আঘাত হানতে উদ্যত হলেন। আর তখনই হুয়েন-স্যাং হস্তক্ষেপ করলেন। তিনি বললেন, "ওরে বিশ্বাসঘাতক শিষ্য! তুমি একজন মা ও তার মেয়েকে হত্যা করেছ, আবার আর একটি পাপ করতে চাও!" সেই দানবীও সেই সুরে সুর মিলিয়ে কান্নাকাটি শুরু করে দিল। সে কেঁদে কেঁদে বলতে লাগল, "তুমি আমার বৃদ্ধা স্ত্রী ও আমার প্রিয় কন্যাকে হত্যা করেছ! আমার বাঁচার আর কিছুই রইল না। তুমি হয়ত আমাকেও হত্যা করতে পারো।" এই কথা বলে সে বানরের দিকে ছুটে গেল।

বানর ক্রুদ্ধ হয়ে চিৎকার করে বলে উঠল, "তুই দানবী, যে রূপই নিস না কেন আমি তোকে চিনি। তুই আমাকে বোকা বানাতে পারবি না!" বানর

যেই তার মুগুর নিয়ে দানবীকে আক্রমণ করতে যাবেন অমনি হ্যুয়ান-স্যাং দানবীর সাহায্যে এগিয়ে এলেন। তিনি বললেন, "একজন বৌদ্ধকে অবশ্যই দয়াবান হতে হবে। যদি এ দানবীও হয় তবুও তোমাকে বোঝাতে হবে যাতে সে তার পথ পরিত্যাগ করে। কিন্তু তুমি কিছুতেই তাকে হত্যা করতে পার না।" কিন্তু বানর সে কথা না শুনে উত্তর দিলেন, "প্রভু আপনি ওকে বাঁচাতে পারেন কিন্তু সে কখনও আপনাকে ছেড়ে দেবে না।"

এ কথা বলে বানর যেই আবার তাঁর মুগুর উঁচিয়ে ধরলেন অমনি হ্যুয়ান-স্যাং তাঁর হাতটা ধরে ফেলে বললেন, "বরং তুমি আমাকে হত্যা কর, তবুও ওকে মেরো না।" দানবী চোখের জল ফেলে আর্ত চিৎকার করে বলতে লাগল, "তুমি কেবল হত্যা করতেই পার। পরোপকার করে ও বুদ্ধের বাণী দিয়ে তোমার কি হবে ?" আর হ্যুয়ান-স্যাং আবার তার জাদুমন্ত্র প্রয়োগ করলেন। বানর মাটিতে পড়ে যন্ত্রণায় ছটফট করতে আরম্ভ করলেন।

দানবী তো আনন্দে আত্মহারা। আর ভীত পিগসি ও স্যানডি বানরের জন্য তাঁকে অনুনয় বিনয় করতে লাগলেন। ফলে প্রভুর মন গলল এবং তিনি জাদুমন্ত্র বন্ধ করলেন। বানর উঠে দাঁড়িয়েই আবার দানবীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। হ্যুয়ান-স্যাং আবার তাঁর জাদুমন্ত্র প্রয়োগ করলেন। ফলে বানর পুনরায় মাটিতে পড়ে যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলেন।

সেই অবস্থাতেই বানর তাঁর সর্বশক্তি সংহত করে দানবীকে প্রচণ্ড একটি আঘাত করলেন। দানবী একটা জাদু প্রক্রিয়া করে পালিয়ে গেল। বানরও তার পেছনে তাড়া করতে আরম্ভ করলেন। আর ঠিক তখনই আকাশে একখণ্ড মেঘ ভেসে এল এবং তার মধ্যে থেকে এক টুকরো হলুদ রংয়ের সিল্কের কাপড় বেরিয়ে এল।

সিল্কের কাপড়টা উড়ে এসে হ্যুয়ান-স্যাং-এর পায়ের কাছে পড়ল। তিনি সেটা কুড়িয়ে নিলেন এবং দেখলেন সেখানে লেখা রয়েছে: "বুদ্ধ করুণাময়। তিনি কখনও প্রাণী হত্যা সহ্য করেন না। যদি আপনি বানরকে আপনার সাথে রাখেন আপনি কখনও বুদ্ধের বাণী পাবেন না।"

সেই লেখা পড়ে হ্যুয়ান-স্যাং একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তিনি বানরকে বললেন যে সে অত্যন্ত উচ্ছৃংখল। সে যেন তার ফুল ও ফলের পাহাড়ের দেশে ফিরে যায়। কিন্তু বানর তার প্রত্যুত্তরে বললেন, "এটাও দানবীর আর একটা কৌশল। আপনি এই কৌশলে পা দেবেন না। পশ্চিমের পথে যাত্রা অত্যন্ত



বিপজ্জনক—সমস্ত পথেই রয়েছে অনেক দানব। আমি আপনার সাথে সমস্ত যাত্রার পথই থাকব।"

পিগসি ও স্যানডিও প্রার্থনা জানাতে লাগলেন যে বানর যেন তাঁদের সংগে যায়। কিন্তু হুয়ান-স্যাং সে কথায় কর্ণপাত পর্যন্ত করলেন না। তিনি বললেন, বানর আমাদের ত্যাগ করুক এটাই বুদ্ধের ইচ্ছা।

অগত্যা বানরকে পিগসি ও স্যানডির কাছে বিদায় নিতে হল। তিনি তাঁদের দু'জনকে বললেন যে তীর্থপথে তাঁরা যেন প্রভুর প্রতি যত্নশীল হন।

তারপর তিনি হুয়ান-স্যাং এর কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে বললেন যে, তিনি যেন ভাল ও মন্দ, মানব ও দানবের মধ্যে পার্থক্য করেন এবং নিজের প্রতি যত্ন নেন। অবশেষে তিনি মেঘে চড়ে তাঁর ফুল ও ফলের পাহাড়ের দিকে যাত্রা করলেন।

আকাশে আঁধার নেমে এল এবং শীতল বাতাস বইতে আরম্ভ করল। তিনজন তীর্থযাত্রী তাঁদের জিনিসপত্র নিয়ে যাত্রা শুরু করলেন। কেউ কোন কথা বললেন না। তাঁরা রাতের আশ্রয়ের কথা চিন্তা করছিলেন। হঠাৎ তাঁরা দূর থেকে একটা ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পেলেন। সেই ঘণ্টাধ্বনি শুনে তাঁরা কিছুটা এগিয়ে যেতেই সামনে একটা বনবীথিকা দেখতে পেলেন। আর তার ভেতরে দেখলেন একটি মন্দিরের লাল প্রাচীর।

মন্দিরটা দেখে পিগসি আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন এবং সন্ন্যাসীকে তাড়াতাড়ি চলবার জন্য অনুরোধ করলেন। হুয়ান-স্যাং বললেন, "আমরা এখানেই ভগবান বুদ্ধের পূজা করতে পারি।" মন্দিরের দ্বারের উপরে ফলকে লেখা আছে: স্বর্গীয় রাজার মন্দির।

সন্ন্যাসী তাঁর ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে এলেন এবং তিনজনে মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করলেন। তাঁরা বুদ্ধমূর্তির সামনে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করলেন যে তাঁদের যাত্রা যেন নিরাপদ ও সফল হয়।

হঠাৎ মূল মূর্তির মুখ খুলে গেল এবং তা থেকে একটা কর্কশ কণ্ঠস্বর বেরিয়ে এল, "যে সন্ন্যাসী ভাল মন্দ বিচার করতে পারে না সে বোকা। তাকে ধর!" এক লহমায় সেই সৌম্যদর্শন মূর্তিটি অনেকগুলো দানবে রূপান্তরিত হয়ে গেল।

তাঁদের প্রভু দানবের খপ্পরে পড়েছেন দেখে পিগসি ও স্যানডি তাঁকে উদ্ধার করার চেষ্টা করলেন। শ্বেত-অস্থি দানবী তীব্র চিৎকার করে তার চেলাদের বলল যে তারা যেন ওদেরকে বেশ ভালভাবে আটকে রাখে। দানবেরা

তীর্থযাত্রীদের অতি সহজেই পরাস্ত করে ফেলল। স্যানডি বন্দী হলেন এবং পিগসি প্রচণ্ড লড়াই করে কোনমতে ওদের হাত থেকে বেরিয়ে পালিয়ে গেলেন।

বাইরে বেরিয়ে এসে পিগসি পেছনের দিকে তাকিয়ে দেখলেন মন্দিরটা উধাও হয়ে গেছে আর একটা গুহার মুখ পাথর আঁটা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। বিদায় নেবার সময় বানরের উপদেশের কথা পিগসির মনে পড়ে গেল। তিনি খুব লজ্জিত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়লেন। এবং শেষ অবলম্বন হিসেবে তিনি তাঁর জাদু মেঘে চড়ে ফুল ও ফলের পাহাড়ে গিয়ে হাজির হলেন। সেখানে তিনি বানরের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবেন।

সেই পাহাড়ের জলপর্দা গুহার বাইরে একদল বানর পিগসির পথ অবরোধ করল। তারা জানাল যে তাদের রাজা আজকাল অতিথি আপ্যায়ন করতে চান না। পিগসি নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন যে তিনি একটি অত্যন্ত জরুরী কাজ নিয়ে এসেছেন। একটি ছোট বানর পিগসিকে জানাল যে তাদের রাজা আজকাল সব সময়ই হুয়ান-স্যাং ও অন্যান্যদের কথা চিন্তা করেন। সেই ছোট বানরটা তাকে অপেক্ষা করতে বলে বানরকে তার কথা জানাতে গেল।

রাজা ফিরে আসায় ছোট ছোট বানরেরা খুবই আনন্দিত হয়েছিল। কিন্তু বানর রাজা ফিরে এসে সর্বদাই নিরুৎসাহ, মনমরা হয়ে বসে থাকেন এবং প্রভুর জন্য চিন্তা করেন। যেই তিনি শুনলেন যে পিগসি এসেছেন তৎক্ষণাৎ তিনি সেই ছোট বানরটিকে বললেন তাঁকে ভেতরে নিয়ে আসতে।

পিগসি এমন বিষন্ন মুখে ভেতরে প্রবেশ করলেন যে বানরের বুঝতে আর দেরী হল না যে একটা কিছু গণ্ডোগোল ঘটেছে। পিগসি সমস্ত ঘটনা খুলে বলে বানরের কাছে আবেদন করলেন—"আপনি আমার সংগে চলুন এবং প্রভুকে উদ্ধার করুন।"

বানর সে কথা শুনে লাফিয়ে উঠলেন, কিন্তু তারপরই আবার বসে পড়লেন। তিনি হেসে বললেন, "চিন্তার কি আছে! প্রভুর সদাশয়তায় নিজেকে শুধরে নিয়ে দানবী তাকে ছেড়ে দেবে।"

পিগসি বানরের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন। তিনি প্রভুর প্রতি দোষারোপ করে একথাও বললেন যে তিনি বানরকে ফিরিয়ে দিয়ে খুবই অর্বাচীনের মতো কাজ করেছেন। কিন্তু বানর তাঁর আসনে বসেই রইলেন—যেন একান্তই নির্বিকার।

পিগসি তা দেখে নিজের বুকে চাপড় মেরে চিৎকার করে বলতে লাগলেন,

"আপনি সমস্ত ন্যায়বোধ হারিয়ে ফেলেছেন। আমিও ভীরু নই, জানবেন। আমি ফিরে গিয়ে লড়াই করে দানবদের শেষ করব।" এই কথা বলে পিগসি অভিমানভরে চলে গেলেন।

পিগসি চলে যাবার সাথে সাথেই বানর তাঁর জোব্বা ও মুকুট ফেলে দিয়ে যুদ্ধে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে নিলেন। ছোট ছোট বানরেরা ব্যাপারটা দেখে ঘাবড়ে গেল।

বানর তাদেরকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললেন, "ঐ দানবীটা অত্যন্ত ধূর্ত। সে যে কোন রূপ গ্রহণ করতে পারে। আমি জানান না দিয়ে ওকে ধরতে চাই তাই আমি পিগসিকে বললাম না যে আমি যাবো।"

গুহার বাইরে এসে, মেঘের পর মেঘের উপর দিয়ে ডিগবাজী খেয়ে বানর অতি দ্রুত তাঁর প্রভুর উদ্ধারের জন্য দানবীর গুহার দিকে যেতে লাগলেন।

দানবীর আলোকোজ্জ্বল গুহাতে একটা প্রচণ্ড হৈ হট্টগোল চলছিল। শ্বেত-অস্থি দানবী নেকড়েকে বলল স্বর্ণালোক গুহায় গিয়ে তার মা সোনালী টৌভ পরীকে সন্ন্যাসী হ্যুয়ান-স্যাং-এর মাংস খাওয়ার ভোজসভায় নিমন্ত্রণ করে আসতে।

ঠিক তখনই ভালুক দৈত্য পিগসিকে বন্দী করে নিয়ে এল। ভালুক দৈত্য তখন পাহারার কাজে নিযুক্ত ছিল। প্রভুর উদ্ধারের জন্য ফল ও ফুলের পাহাড় থেকে ফিরে এসে পিগসি ভালুক দৈত্যের খপ্পরে পড়েন। সেখানে তার সাথে লড়াইয়ের পর পিগসি ভালুক দৈত্যের হাতে বন্দী হন।

পিগসিকে দেখে শ্বেত-অস্থি দানবী তো আনন্দে আত্মহারা। সে তার লোকদের আদেশ করল হ্যুয়ান-স্যাং ও স্যানডিকে ভেতরে নিয়ে আসার জন্য। তিনটি বন্দীর মাংসে মহাভোজের কথা ভেবে তার জিভ জলে ভরে উঠল। আহা, কি মজা, সে ও তার মা তিন বন্দীর তাজা রক্ত পান করবে ও মাংস খাবে।

অশ্রুসিক্ত নয়নে পিগসি, হ্যুয়ান-স্যাংকে তার ফুল ও ফলের পাহাড়ে যাবার কথা বললেন। পিগসি বললেন, "বানর বলেছেন আপনি দয়ালু, আপনি দানবীকে বুঝিয়ে নিশ্চয়ই মুক্তির ব্যবস্থা করতে পারবেন।" হ্যুয়ান-স্যাং কিছুই বললেন না। কেবল দৈত্যরা তার অসহায়তা দেখে অট্টহাস্য করে উঠল। বানর যে ফুল ও ফলের পাহাড় ছেড়ে আসতে অস্বীকার করেছে এই সংবাদ পেয়ে তারা পরস্পরকে অভিনন্দন জানাল। আর তখনই একটি মামদো

ভূত এসে খবর দিল যে বৃদ্ধা সোনালী টৌড পরী এসে উপস্থিত হয়েছে। এই সংবাদে চারিদিকে আনন্দের ঢেউ খেলে গেল।

দৈত্যরা বৃদ্ধা পরীকে গুহার ভিতরে নিয়ে এসে সিংহাসনে বসতে দিল। বৃদ্ধা সেই সিংহাসনে বসে তিনটি নধর বন্দীকে দেখে দাঁত কড়মড় করতে লাগল।

শ্বেত-অস্থি দানবী মামদো ভূতদের বলল তিনজন বন্দীকে হত্যা করতে। কিন্তু বৃদ্ধা দানবী হাত নেড়ে বলল, "দাড়াও! আমি হ্যুয়ান-স্যাংকে ভাল করে দেখবো। আমায় জানতে হবে সে কেমন লোক। কি খাচ্ছি না জেনে আমি কখনও মাংস খেতে পারি না।" সে সন্ন্যাসীর কাছে হেঁটে গেল এবং চোখ কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি হ্যুয়ান-স্যাং? তোমার কতজন শিষ্য আছে?"

হ্যুয়ান-স্যাংকে উত্তর দেবার সুযোগ না দিয়ে স্যানডি চিৎকার করে উঠলেন, "তোর বকবকানি থামা। আর দেরী না করে আমাদের তাড়াতাড়ি মেরে ফেল!" এই কথা বলেই তিনি বৃদ্ধা পরীকে এমন একটি লাথি মারলেন যে সে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। শ্বেত-অস্থি দানবী তার মাকে সাহায্য করার জন্য ছুটে গেল এবং তাকে বলল যে স্যানডি হ্যুয়ান-স্যাং এর তৃতীয় শিষ্য। বৃদ্ধা হেসে উঠে বলল, "তুমি খুবই প্রভুভক্ত, স্যানডি।"

বৃদ্ধা পরী দানবী পিগসির দিকে তাকাল। এবং তারপর সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞেস করল তার প্রথম শিষ্য কোথায়। সন্ন্যাসী একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "সে একদিনে তিনজন লোককে হত্যা করেছে বলে আমি বুদ্ধের ইচ্ছানুসারে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি।"

শ্বেত-অস্থি দানবী হাসতে হাসতে তার মাকে জানাল, "জানো মা, সন্ন্যাসী এত বোকা যে মরার সময়েও তার বুদ্ধি খোলে না। আমি ওর প্রথম শিষ্য সম্পর্কে ওকে একেবারে বোকা বানিয়ে দিয়েছি।" বৃদ্ধা দানবী জিজ্ঞেস করল, "কি করে করলি রে? ওরা তোকে চিনতে পারল না? তোর কৌশল ধরতে পারল না?"

"তুমি যদি বিশ্বাস না কর তো তোমায় আমার কৌশল দেখাচ্ছি!" শ্বেত-অস্থি দানবী হেসে উত্তর দিল। তারপর চোখের নিমেষে সে মিলিয়ে গেল। এবং বৃদ্ধা দানবীর সামনে এসে দাঁড়াল একটি যুবতী মেয়ে যার হাতে রয়েছে ধুমায়মান বান-রুটি ভরা একটি বাক্স। সেই মেয়েটি মিষ্টি হাসি হেসে পিগসির কাছে গিয়ে ঠাট্টা করে বলল, "ও আমার ছোট্ট সন্ন্যাসী, আমার সাথে মন্দিরে

গিয়ে কিছু খাবার খাবে না ?" পিগসি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন এবং দানবীকে চিনতে না পারার জন্য নিজেকে গালাগাল করতে লাগলেন।

এবার মুহূর্তের মধ্যে মেয়েটিও উধাও হয়ে গেল এবং তার জায়গায় এল এক বৃদ্ধা মহিলা। মহিলাটি লাঠিতে ভর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দাবি করল, "কেন তুমি আমার মেয়েকে হত্যা করেছ ?" সন্ন্যাসী অস্ফুটস্বরে চিৎকার করে, হতবিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। মহিলাটি খুশীতে ডগমগ হয়ে হুংকার দিয়ে উঠল। তারপর হঠাৎ সন্ন্যাসীর সামনে এসে হাজির হল এক বৃদ্ধ লোক। সে বলল, "মহামান্য সন্ন্যাসী, তোমায় ধন্যবাদ। তুমি আমার জীবন রক্ষা করেছ।"

সন্ন্যাসী চমকে উঠলেন—যেন এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলেন। তিনি রেগে প্রশ্ন করলেন, "শয়তানী দানবী, কেন তুই আমাকে বার বার প্রবঞ্চিত করেছিস ?" সেই বৃদ্ধ দানবটি হেসে উত্তর দিল যে সে তার মাংস খেতে চায়, তাই।

স্যানডি আর সহ্য করতে না পেরে সেই দানবীকে অভিসম্পাত করতে লাগলেন। কি দুঃখের কথা তাঁর প্রভু এত নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিলেন। সেই বৃদ্ধ লোকটি তার লাঠিটা দোলাল এবং মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে সেই শ্বেত-অস্থি দানবীতে রূপান্তরিত করল।

হ্যুয়ান-স্যাং হতবুদ্ধি হয়ে প্রশ্ন করলেন, "তাহলে সেই বুদ্ধের অনুশাসনটা এল কোথা থেকে ?" দানবী তার উত্তরে একটি হলুদ সিল্কের কাপড়ের ফালি বার করল যার দ্বারা প্রবঞ্চিত হয়েই সন্ন্যাসী বানরকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

সন্ন্যাসী তখন আবেদন করে বললেন যে যেহেতু তিনি তিন তিনবার দানবীর জীবন রক্ষা করেছেন সেহেতুই তাঁদের ছেড়ে দেওয়া উচিত। বৃদ্ধা দানবী নাক কুঁচকে বলে উঠল, "সন্ন্যাসী, দয়া তোমার ধর্ম, কিন্তু মানুষের মাংস আমাদের প্রয়োজন। যদি তুমি মনে কর যে একটি দানবকে বলে তুমি তাকে দিয়ে দয়ার কাজ করাতে পারবে, তাহলে বলব তুমি পাগল !"

সন্ন্যাসী যখন বুঝতে পারলেন যে তাঁর অন্তিম সময় উপস্থিত হয়েছে, তখন তিনি অনুতাপে চিৎকার করে বলে উঠলেন, "বানর, তোমাকে তাড়িয়ে দেওয়া আমার উচিৎ হয় নি !" তখন হঠাৎ সেই বৃদ্ধা পরী দানবী ঘোষণা করল যে বানর এখানেই আছে।

এ যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত। সেই বৃদ্ধা সোনালী চৌড পরী মুহূর্তের মধ্যে উধাও হয়ে গেল এবং তার জায়গায় আবির্ভূত হলেন বানর, সত্যিকারের বড় বানর। তিনি তাঁর মুগুর নিয়ে শ্বেত-অস্থি দানবীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

শ্বেত-অস্থি দানবী ও তার দলবল অস্ত্রের জন্যে ছুটোছুটি আরম্ভ করে দিল। বানর তাঁর জাদু কৌশল প্রয়োগ করায় অনেকগুলো বানর আবির্ভূত হল এবং তারা হুয়ান-স্যাং ও অন্যান্যদের মুক্ত করল।

বানর রক্ষীরা হুয়াং-স্যাংকে আগলে গুহার বাইরে বার করে আনল। আর পিগসি ও স্যানডি বানরের সাথে দানবদের বিরুদ্ধে লড়াইতে সামিল হলেন। তাঁরা প্রচণ্ড লড়াই করলেন এবং দানবেরা প্রাণের ভয়ে পালাতে লাগল।

গুহার বাইরে বেরিয়েই শ্বেত-অস্থি দানবী আরেক ছদ্মবেশ ধারণ করবার চেষ্টা করল। আর ঠিক তখনই বানর ছুটে এসে তাঁর মুগুরের এক চূড়ান্ত আঘাতে তার ইহলীলা সাঙ্গ করল। অন্যান্য দানবেরা আর বেশীক্ষণ লড়াই করতে পারল না। একে একে সকলের পতন হতে আরম্ভ করল।

যুদ্ধ শেষে বানর এসে হুয়ান-স্যাং এর সাথে দেখা করলেন। সন্ন্যাসী অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, "তুমি কি ভাবে ফিরে এলে?" বানর তখন সন্ন্যাসীকে বললেন কিভাবে তিনি বৃদ্ধা সোনালী চৌড পরীর সাক্ষাৎ পেলেন এবং তাকে হত্যা করে তার রূপ গ্রহণ করলেন।

পিগসি মুচকী হেসে শ্বেত-অস্থি দানবীকে পরাস্ত করার জন্য বানরকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করলেন। বানর অবনত মস্তকে বললেন, "দানবদের প্রতি দয়া দেখাতে নেই!"

এদিকে ভোর হয়ে এসেছে। সন্ন্যাসী যাত্রা করার জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছেন। বানর পথ নির্দেশ করতে লাগলেন, আর চারজনে নিরাপদে পশ্চিমের দিকে এগিয়ে চললেন।





আমি রেলগাড়ী

ইয়ে শেং-তাও

ইংলণ্ডে এক কারখানায় আমার জন্ম। চীনা জনসাধারণকে সেবা করার জন্য তারপর আমি চলে এলাম চীনে। বিরাট একটি পেট আমার। কালো চকচকে কয়লার চাই দিয়ে শ্রমিকেরা আমাকে প্রতিদিন খেতে দেয়। আমি খাচ্ছি তো খাচ্ছি। মনে হয় আমি যেন একটি অতল গহ্বর। যখন কয়লাগুলো হজম করি সবেগে একটা শক্তি আমার সারা শরীর সবল করে তোলে। আমি এখন কেবল দৌড়োতে চাই। আমার খুব গর্ব হতো যদি আমি এক নিশ্বাসে হাজার হাজার মাইল দৌড়োতে পারতুম। আটটি চাকা হল আমার পা। ওগুলো খুব শক্ত এবং দ্রুতগামী কিন্তু যে কোনো প্রাণীর পা থেকে পৃথক। বিরাট যখন চাকাগুলো ঘুরতে শুরু করে সবচেয়ে দ্রুতগামী ঘোড়াও তখন আমার সাথে পাল্লা দিয়ে পারে না। একটি বড় চোখ আছে আমার। রাত্রিবেলা চাঁদ বা তারা না থাকলেও সামনের রাস্তা পরিষ্কার দেখতে পাই। আমার কণ্ঠস্বর বেশ মজবুত। আমি যখন শব্দ করি পথের ধারে গাছগুলো কাঁপতে থাকে, মাথার উপরে মেঘগুলি বাতাসে আন্দোলিত জলের মত ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

বহু বছর ধরে আমি চীনদেশে আছি। সাংহাই এবং নানকিঙ-এর মধ্যে আমি যাতায়াত করি। যাত্রাপথটি আমার এতই পরিচিত যে আমি চোখ বন্ধ করেও দুটো শহরের মাঝখানের জায়গাগুলো চিনতে পারি। পাকাই পাহাড়ের গুহা, নানা শহরের প্যাগোডা, বিখ্যাত কাঁকড়ার ইয়াংচেঙ্ হ্রদ এবং উশির শিল্পাঞ্চল ঘিরে উঁচু চিমনি। কিন্তু সবকিছুর নাম করার প্রয়োজন নেই। বাঁশঝাড়ের পিছনে একটি কুড়েঘরে যে জায়গায় একজন বৃদ্ধ চাষী ও তার স্ত্রী বাস করে আমি তাও বলতে পারি। আমি বলতে পারি একটি পাথুরে সেতুর কথা যেখানে জেলেরা প্রায়ই মাছ ধরতে আসে। আমি এই সমস্ত

জায়গাগুলো জানি এবং আমি আমার নিজের নামও জানি। আর জানবো না-ই বা কেন? প্রতিদিন যাতায়াতের পথে ঘন ঘন আমি তাদের পাশ দিয়ে যাই।

আমি মানুষকে সেবা করতে ভালবাসি। যেহেতু আমার প্রচুর শক্তি এবং জোরে দৌড়োতে পারি সুতরাং বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে আমি মনমরা হয়ে পড়ি। আমার অসীম শক্তিকে আমি কাজে লাগাতে পারি না। তাছাড়া মানুষগুলো, যাদের আমি সেবা করি, বড়ই সুন্দর। স্কুলের পথে ছাত্ররা যাচ্ছে, চাষীরা ফসল, শাকসবজি নিয়ে বাজারে যাচ্ছে। একজন বৃদ্ধা মহিলা এক ঝুড়ি উপহার নিয়ে তার মেয়ের কাছে যাচ্ছে বেড়াতে। একজন ভ্রমণকারী হাতে একখানি গাইড বই নিয়ে সুন্দর জায়গাগুলো ঘুরতে চলেছে। তারা সকলেই কিছু না কিছু কাজ নিয়ে আমাকে সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছে। সুতরাং আমি ভাবি, তাদের সেবা করা আমার একমাত্র অধিকার।

কিন্তু কখনো কখনো আমি বিষণ্ণতা বোধ করি। একটা সময় একজন লোক, যাকে আমি চিনি না, আমাকে আদেশ করলো কেবল মাত্র তাকেই একটি নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য। সে যাত্রায় কোনো যাত্রীই—ছাত্র, কৃষক, বৃদ্ধা মহিলা এবং ভ্রমণকারী আসেনি। আমি সেই একজন মানুষকেই সেবা করলাম। এটা কি একজন মানুষের প্রতি দাসত্ব মনে করছো না? সেই মানুষটির সঙ্গে ছিলো তার দেহরক্ষীরা। তাদের পরনে সেনাবাহিনীর পোষাক, কোমরের চারপাশে জড়ানো কার্তুজ এবং কাঁধের উপর ঝোলানো রাইফেল। ওরা কোনো জায়গায় যেতে উৎসাহী ছিল না। একমাত্র ঐ লোকটির সেবার জন্যই তারা প্রস্তুত। তোমরা কি মনে করছোনা ওরাও সকলে দাস। যাক, বেশী কথার দরকার নেই…। তারপর, যখন আমি খুঁজে দেখলাম যে কেন লোকটি ঐ জায়গায় অত তাড়াহুড়ো করে যেতে চাইছিল, আমার প্রচণ্ড ঘৃণা হলো। মাত্র তিনদিন আগে দেখা এক বন্ধুর সাথে সে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলো। কিছুক্ষণ তার সঙ্গে গল্পো করে সে স্নান করতে গেল। তারপর একজন সুন্দরী মেয়েকে ডেকে নিয়ে নাচ-ঘরে গেল। এইরকম মানুষের দাস আমি কেন হতে যাবো? যদি আবার আমাকে ঐ ধরনের কাজ করতে বলা হয়, আমি বিদ্রোহ করবো—আমি যাবো না। লজ্জাটা এই যে আমার ইঞ্জিনটি অন্যের দ্বারা চালিত। একবার যদি তারা আমাকে শুরু করতে বলে, আমি দৌড়োনো ছাড়া কিছুই করতে পারি না। পথে যেতে আমি অনেক

সময় ভেবেছি, আমি লাইন থেকে পড়ে গিয়ে নিজেকে ধ্বংস করবো এবং সঙ্গে সেই জঘন্য লোকটিকেও। ঐ যাত্রার সময় পথের ধারের দৃশ্যগুলোর দিকে তাকাতে আমার ইচ্ছে হতো না। ঘৃনায় আমার কণ্ঠস্বর এতই আটকে আসতো যে চিড়িয়াখানায় সিংহের গর্জনের মত শোনাতো।

পুরো এক পেট কয়লায় আট পায়ে নতুন শক্তি নিয়ে গতকাল সকালে আমি যখন উৎসাহভরে ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে আছি; দেখি দু'তিন হাজার ছাত্রছাত্রী হঠাৎ ষ্টেশনের দিকে ছুটে আসছে। তাদের সবার পরনে স্কুলের পোষাক। আমি পরখ করে দেখলাম, তাদের বয়স তের অথবা চোদ্দ থেকে তিরিশের কাছাকাছি হবে। তারা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিল—হ্যাঁ ঠিকই—সেই যোদ্ধাদের কথা যারা ১৯৩২ সালে সাংহাই-এ জাপানের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। সাহসী ও আত্মনিষ্ঠ ওদের চোখে পলক পড়বে না যদিও ওদের সামনে হঠাৎ পাহাড় ধ্বসে পড়ে। ওদের কথাবার্তা থেকে আমি বুঝলুম যে ওরা একটা গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সমস্যা নিয়ে চিন্তিত। এবং নির্দিষ্ট মানুষগুলোর মাঝে ওদের আবেদন রাখবার জন্য ওরা চাইছে আমি ওদের পৌছে দিই।

সত্যি, এই ধরনের কাজ আমাকে করতেই হয়। দেশ যখন বিপদাপন্ন তখন ছাত্রদের স্কুলে পৌছে দেওয়া বা চাষীদের জিনিস বিক্রি করার চাইতেও বেশী গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো ছাত্রদের মতামতকে মানুষের সামনে তুলে ধরা। কি করেই বা আমি ওদের সাহায্য করতে অস্বীকার করি? "চলে এসো সব" আমি বললাম, "তোমাদের আমি নিয়ে যাবো। যত দ্রুত সম্ভব দৌড়ে আমি তোমাদের পৌছে দেব" এই কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ শব্দ করলাম; "হু—উ—উ"।

ওরা যেন জানতো যে আমি ওদেরই কথা ভাবছি। আমার পিছনে যাত্রীকামড়ায় সমস্ত ছাত্ররা হৈ হৈ করে জড়ো হয়ে গেল। এত তাড়াতাড়ি ভরে গেল যে কাউকে রেলিং ধরে পাদানিতে শুধু দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। ওরা বলল: "আমরা আনন্দ করতে বেরোই নি। গন্তব্যস্থলে পৌছোনো পর্যন্ত আমরা কোনো অসুবিধার কথা ভাবছি না।"

দ্রুতবেগে হঠাৎ কিছু পুলিশ ঠেলাঠেলি করে গাড়িতে উঠল। দৈনিক যাত্রীদের নেমে আসবার জন্য চিৎকার করে উঠল। তারা বলল যে ট্রেন যাবে না। কী যে ঘটেছে আমি বুঝলাম না। ছাত্রদের কাজে লাগবো ভেবে সবেমাত্র আমি নতুন কয়লা নিয়েছি। কেন ওরা বলছে যে ট্রেন যাবে না? আমার খুব কষ্ট হল। দেখলাম, হতাশ যাত্রীরা হাতে স্যুটকেশ ও মালপত্র

নিয়ে ট্রেন থেকে নেমে আসছে। মনে হচ্ছিল যেন আমি ওদের কাছে ঋণী। আমি বলতে চাইলাম : "আমি সর্বদাই তোমাদের কাজের জন্য প্রস্তুত, কিন্তু দুর্ভাগ্য আজকে পারলাম না"।

প্রায় সমস্ত দৈনিক যাত্রী নামবার পর পুলিশ ছাত্রদেরও নেমে আসতে বললো। তাদেরও জানালো যে ট্রেন যাবে না। আমার ধারণা ছিল যে ছাত্ররা সঠিক এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্যই ট্রেনে উঠেছে। আমি ভাবিনি যে অন্যান্য যাত্রীদের মতো তারা সহজেই হতাশ হয়ে ট্রেন থেকে নেমে যাবে।

আমার প্রত্যাশা মতই ছাত্ররা চেঁচিয়ে বলে উঠল : "আমরা গন্তব্যস্থলে না পৌঁছনো পর্যন্ত ট্রেন থেকে নামবো না"। তাদের কণ্ঠস্বর তরঙ্গিত স্রোতের মত গর্জে উঠল।

"হু—উ—" আমি শব্দ করে তাদের চিৎকারে সাড়া দিয়ে বলতে চাইছিলাম : "গন্তব্যস্থলে তোমাদেরকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমার শক্তি ও ইচ্ছা দুই আছে"।

ব্যাপারটা বিপজ্জনক দিকে বয়ে গেল। গোটা পুলিশ বাহিনী দু'তিন হাজার ছাত্রকে টেনে নামিয়ে আনতে পারে না। যা তারা করতে পারতো তা হল ষ্টেশনটাকে চারপাশে ঘিরে রাখা—যেন যুদ্ধ লেগেছে। সে এক দৃশ্য। কিছু যাত্রী বাড়ী চলে গিয়েছিল। অন্যরা তখনও দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনের আসনে বসে ছিল। পুলিশবাহিনী মাটিতে পোতা কাঠের খুঁটির মতো দাঁড়িয়ে রইল। ওদের দ্বিধাগ্রস্ত ও ফ্যাকাশে মনে হচ্ছিল, যেন মারাত্মক শত্রু দ্বারা কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। চীনে বহুদিন থাকাকালীন এই প্রথম এই রকম অবস্থার মুখোমুখি হলাম আমি। পুলিশ যত না তাড়াতাড়ি এই কৌতুহলী জনতাকে লোহার বেড়ার বাইরে সরিয়ে দিচ্ছে ততই তারা অবস্থাটা দেখবার জন্য ভীড় করছে।

তারপর এক এক করে একদল বিষণ্ণ প্রকৃতির লোক এসে হাজির হল। তাদের কারো কারো পরনে বিদেশী পোষাক, কারো বা নীল গাউন ও কালো জ্যাকেট। ওদের মধ্যে পাকা দাড়ির বৃদ্ধ এবং সোনালী ফ্রেমের চশমা পড়া যুবকও রয়েছে। ওদের মুখগুলো চকচক করছিল, দেখে মনে হল যেন অনেকটা পরিমাণ ঠাণ্ডা ক্রীম ঘসে এসেছে। ছাত্রদের সাথে কথা বলার জন্য আতঙ্কিত চোখে ওরা গাড়ীতে উঠল। ওদের চাহনিতে ভয়ংকর সংকটের ছাপ। ছাত্রদের সাথে ওদের কী কথা হল আমি শুনতে পেলাম না কিন্তু অনুমানে

বুঝলাম যে পুলিশ যা বলেছিল তাই হবে। ট্রেন যাবে না, ওদের বাড়ী চলে যাওয়াই ভাল। তা না হলে ওদের অত চিন্তিত দেখাবে কেন?

আমি কিন্তু ছাত্রদের সব কথা শুনলুম: "আমরা গন্তব্যস্থল না পৌঁছোনো পর্যন্ত নামবো না"। তরঙ্গিত স্রোতের মতো যৌবনের কণ্ঠস্বর গর্জে উঠল।

"হু—উ—" তাদের চিৎকারে আমি শব্দ করে সাড়া দিয়ে বলতে চাইছিলাম: "তোমাদের প্রতি আমার সহানুভূতি আছে। তোমাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দিতে আমি ইচ্ছুক"।

অনেকটা সময় পেরিয়ে গেল। আমাকে চলতে দিলে এই সময়ের মধ্যে আমি কয়েক'শ মাইল পথ চলে যেতাম। কিন্তু তখনও সমস্যার সমাধান হল না। ঐ বিষণ্ণ প্রকৃতির লোকগুলোর সঙ্গে আরো অনেকে এসে জুটল। তারা ট্রেনে উঠে ছাত্রদের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলল এবং আরো বিষণ্ণ চোখে ট্রেন থেকে নেমে পড়ল। বাতাস গর্জে উঠছে, যেন আমার সাথে পাল্লা দিতে চাইছে। আমি তার জন্য আদৌ ভীত নই। আমার ইঞ্জিন চালু হওয়ার সাথে সাথেই আমাকে চলতে হয়েছিল। বাতাসকেও পথ করে দিতে হয়েছে। ছাত্ররাও বাতাসের জন্য ভীত নয়। জানলার ধারে বাইরের দিকে তাকিয়ে যারা দাঁড়িয়েছিল, ঘৃণায় তাদের চোখ জ্বলছিল। কেউ কেউ ট্রেন থেকে প্লাটফর্মে হাঁটা-চলা করছিল। দৃঢ়ভাবে মাটি আঁকড়ে থাকা সৈনিকের মত বীর বলে মনে হচ্ছিল তাদের। খিদের সময় খাবার খাচ্ছিল তারা। তৃষ্ণা পেলে সন্ধানী বালকের কেটলী থেকে ফুটন্ত জল পান করছিল। তারা বলছিল যে যতক্ষণ ট্রেন থাকবে তারাও ততক্ষণ ওখানে থাকবে। আমি লক্ষ্য করছিলাম যে তাদের সেই মনোবল ছিল। এতক্ষণ কাঠের খুঁটির মতো দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশগুলোকে ক্লান্ত ও তন্দ্রাচ্ছন্ন দেখাচ্ছিল। তাদের কেউ কেউ হাই তুলছিল। অন্যেরা পা ব্যথা এবং সিগারেট না পাওয়ার অভিযোগ করছিল।

এই অবস্থা দেখে আমার মেজাজ চড়ে গেল। আমি ভাবছি, আমার নিজের ক্ষমতা আছে। ওদেরকে যেখানে ইচ্ছে নিয়ে যেতে পারি। এতে পুলিশের কিছু করার নেই। ছাত্রদের গন্তব্যস্থলে নিয়ে যেতে কেন তারা আমাকে বাধা দেবে। আমি তো কাজের জন্যই আছি। কয়েকটা পাক ঘুরে আসার পর, আমি ঘামতে শুরু করি এবং ভাল থাকি। আমি কেন দশ ঘণ্টারও বেশী সময় ধরে বিনা কাজে দাঁড়িয়ে থেকে কুঁড়ে হয়ে যাবো? আমি অলস হতে চাই না, এতে আমার খারাপ লাগে।

আমি যাত্রা করতে চাইছিলাম। "হু—উ—" শব্দ করলাম। যদি একবার আমার চাকা ঘোরে, কোনো সেনাবাহিনী বা হাজার হাজার বুনো ঘোড়াও আমাকে থামাতে পারবে না। কেবল ঐ বিষণ্ণ মুখের লোকগুলো ও ক্লান্ত পুলিশগুলো থাকুক। "হু—উ—" আমি যাত্রা করতে চাইছিলাম। কিন্তু আমার চাকাগুলো নড়লো না। অসুবিধাটা কোথায় বুঝলাম, আসলে আমার ইঞ্জিনটা অন্যের দ্বারা চালিত। যদি আমার ইচ্ছেমতো কাজে আমি স্বাধীন হতাম, তাহলে অনেক আগেই ছাত্রদের আমি গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দিতাম। আমি কখনোই সেই লোকের কাজ করতাম না যে কেবল স্নান করে সুন্দরী মেয়ের সাথে দেখা করতে যায়। আমি বললাম: ওহে কে আমার ইঞ্জিন চালাবে? "হু—উ—উ" কেউ আমার ডাক শুনেছে। হঠাৎ চালকটি এসে তার অভিজ্ঞ হাত দিয়ে আমার ইঞ্জিন ছেড়ে দিল। "আঃ কি সুন্দর! আমি কখন যেতে পারছি। ছাত্রদের সাহায্য করতে পারছি। "হু—উ—" বাতাসের মতো আমি ঠেলা দিলাম।

"অবশেষে আমরা সফল হলাম!" তরঙ্গিত স্রোতের মত ছাত্রদের কণ্ঠস্বর গর্জে উঠল। ছোটখাটো একটা ঝড়ের আওয়াজ আসছিল কিন্তু ছাত্রদের চিৎকারে তা ডুবে গেল। বুনো হাঁসের পালকের মতো চারদিকে তুষারকণা পড়তে শুরু করল। যাই হোক আমি কখনো তুষারপাত বা ঠাণ্ডায় ভয় পাই নি, কেননা আমার শরীরের উত্তাপে সবকিছু গলে যায়। এমনকি একটা বরফের চাই পর্যন্ত আমার সংস্পর্শে এলে গলে যাবে, আর পালকের মতো তুষারকণার কথা না-ই বা বললাম। ছাত্ররাও ঠাণ্ডাকে গ্রাহ্য করছিল না। জানলার বাইরে হাত বাড়িয়ে ওরা তুষারকণা ধরছিল। একসঙ্গে ওরা 'তুষার অভিযানের' গান গাইছিল।

আমার চাকার নীচে রেললাইন পিছলে যাচ্ছিল। মাঠঘাট, নদী, গাছপালা, গ্রামগুলি অন্ধকারে যেন পাক খাচ্ছিল। বাতাসে ধুলোর মত বরফ পড়ছিল। আমি তখন অদম্য উৎসাহী ছাত্রদের দেশপ্রেমের অভিযানে দুরন্ত বেগে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছি।

হঠাৎ চালকটি ইঞ্জিনটাকে থামিয়ে দিল এবং নেমে পড়ল। আমি বাধা পেয়ে ক্রমশ থেমে গেলুম। কেন? কী ব্যাপার? আমি অবাক হয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললাম। সামনের দিকে তাকিয়ে দেখি একটা বিরাট নদী। সেই জলে বিষাদের সুরে গান বাজছে। আঃ সেহ জায়গা, যেখানে আমরা ছিলাম।

আমায় মনে পড়ল, শরৎ এবং বসন্তের সুন্দর আবহাওয়ায় আমি প্রায়ই ভ্রমণকারীদের এই জায়গায় নিয়ে আসতাম। তারা সবাই বোট চালাতে যেত। নদীর পারে গান গাইত। কিন্তু এই ছাত্ররা তো ভ্রমণকারী নয়। তারা দেশের সামনে বিপদের কথা ভেবে চিন্তিত। অন্যদের মতো তারা দিনটাকে উপভোগ করতে আসে নি। কিন্তু কেন আমরা ওখানে থামলাম।

ছাত্ররাও অবাক হয়ে চিৎকার করে উঠল: "আমরা কেন এখানে থামলাম, চল, যতক্ষণ না আমরা গন্তব্যস্থলে পৌঁছোচ্ছি থেমো না।" তারা গলা চড়িয়ে চেঁচাতে লাগল যেন থেমে পড়ার জন্য আমাকেই দোষারোপ করছে।

আমি মনে মনে ভাবছি: "হে আমার প্রিয় ছাত্র, আমি তো তোমাদের গন্তব্যস্থলে নিয়ে যেতে পারি কিন্তু আমার ইঞ্জিন যে থেমে গেছে। তাড়াতাড়ি চালককে খুঁজে বার করো এবং তাকে আবার চালাতে বলো। তাহলেই আমি সকলের জন্য আগের চেয়ে আরো দ্রুত গতিতে ছুটতে পারব।" আমি ভাবছি আর আমার দুঃখ হচ্ছে।

প্রায় এক ডজন ছাত্র ব্যাপারটা দেখবার জন্য নেমে এল। চালককে দেখতে না পেয়ে এবং তার অনুপস্থিতির সম্ভাব্য কারণ বুঝতে পেরে তারা তাড়াতাড়ি অন্যদের ব্যাপারটা জানাল।

"চালককে খুঁজে দেখ, তাকে আমাদের বার করতে হবে"—ছাত্ররা চেঁচিয়ে বলে উঠল। "এই রকম একটা অ-স্থানে সে বেশীদূর যেতে পারে না।" তারপর তারা প্রত্যেকটা কামরাতে খোঁজ করতে লাগল। সীটের তলা, প্রস্রাবখানা এমনকি মাল রাখবার জায়গা এবং ফেরিওয়ালা যেখানে জিনিসপত্র রাখে সেখানেও খুঁজে দেখল। কিন্তু তবুও চালকের হদিশ পাওয়া গেল না। ছাত্ররা খোঁজখবর চালিয়ে যেতে লাগল। অবশেষে তাকে দেখতে পাওয়া গেল, মাথায় একটা রুমাল বেঁধে রান্নাঘরের ছোট্ট জায়গায় ঠেসে বসে আছে। ছাত্ররা তাকে আমার কাছে নিয়ে এল এবং তখনি গাড়ী ছাড়তে বলল। আমার প্রিয় পুরনো চালক বন্ধুটি হাতেনাতে ধরা পড়ে এতই বিব্রত বোধ করছিল যে চোরের মত আধ-বোজা চোখে তাকিয়ে রইল। আমি এর আগে কখনো তাকে ঐ ভাবে দেখিনি। সাধারণত সে খুব হৈচৈ করা পুরনো মানুষ, গাড়ী চালাতে চালাতে নানারকম জনপ্রিয় গান গাইত। কিন্তু এখন সে একেবারে আলাদা মানুষ। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হল যদিও সে আমার গরম শরীরের খুব কাছেই দাঁড়িয়েছিল তথাপি শীতের রাস্তায় লোকের পিছু ছুটে বেড়ানো ভিক্ষুকের মত সে কাঁপছিল।

"আমি দুঃখিত, আমি আর ট্রেন চালাতে পারছি না"—সে কাঁপা কাঁপা স্বরে বিড়বিড় করে নীচু গলায় বলল।

ছাত্ররা জিজ্ঞেস করলো: "কেন আপনি আর চালাতে পারবেন না"।

"আমার উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ আমাকে তাই নির্দেশ দিয়েছে।"

"আপনি কেনই বা চালিয়েছিলেন?"

"সেটাও কর্তৃপক্ষের হুকুম। তারা তোমাদের এখানে আনতে বলেছেন। এখানে আনা হয়েছে, এখন আর আমি যেতে পারছি না"।

"আচ্ছা এই ব্যাপার ঘটেছে"! ছাত্ররা বিস্ময়ের সথে বলল।

"কিন্তু কর্তৃপক্ষের কথা ভুলে যান, চলুন, আমাদের জন্য গাড়ী ছাড়ুন"। ছাত্ররা তাকে ঠেলে নিয়ে এল তার জায়গায়। এমনকি কেউ কেউ তার হাত দুটোকে চালন যন্ত্রের দিকে নিয়ে গেল। কেমন করে সে একা এতগুলো ছাত্রের কাছে 'না' বলবে। অবশ্যই সে পারে না। সুতরাং ধীরে ধীরে সে ইঞ্জিন ছাড়ল। তার হাত দুটো কাঁপছিল, যেন একটা বিষাক্ত সাপ সে নাড়াচাড়া করছে, ইঞ্জিন নয়।

"প্রিয় বন্ধু, ইঞ্জিনটা জোরে চালাও"—আমি বললাম। "একবার তুমি আরম্ভ করলে আমি দ্রুত গতিতে ছুটতে পারব। ছাত্ররা তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করবে"।

কিন্তু আমার বন্ধুর হাতদুটি এত শক্ত মনে হচ্ছিল যে কোনো গতিই নিতে পারছিল না। ছাত্ররা একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

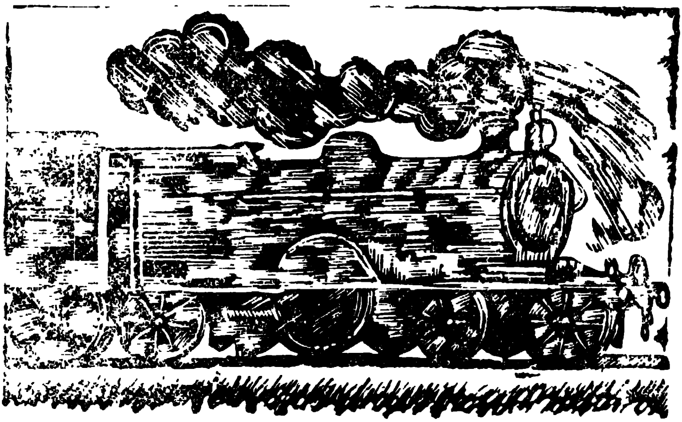
হঠাৎ দু ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়ল তার চিবুকে। দুঃখের সাথে সে বলল: "আমি যদি আর এগোই তবে গুলিবিদ্ধ হবো। ভাই, আমাকে একটি পরিবার চালাতে হয়"।

"ও! সেটা ভীষণ নিষ্ঠুর, নির্দয় ব্যাপার হবে।"

"ঠিক আছে, ওকে ছেড়ে দাও" সহানুভূতির সাথে বয়স্ক ছাত্ররা বলল। ওর মৃত্যু হলে গোটা পরিবার দুঃখ দুর্দশায় পড়বে, এমন কাজ আমরা কখনো করতে পারি না। আমাদের মধ্যে যন্ত্রবিদ্যা ছাত্ররা ইঞ্জিন সম্পর্কে কিছু জানে। ঠিক আছে নিজেরাই চেষ্টা করে দেখি"।

"আচ্ছা, চেষ্টা করা যাক, অবশেষে একটা পথ বার হল। সবাই আনন্দে চিৎকার করে সম্মতি জানাল। কিছু বয়স্ক ছাত্ররা ইঞ্জিনের কাজ শুরু করে দিল। আমার বন্ধুটি ইঁদুরের মতো পালিয়ে গেল।

আবার আমার চাকার তলায় রেললাইন পিছনে যেতে লাগল। মাঠঘাট, গ্রাম, নদী, গাছপালাগুলো অন্ধকারে পাক খেতে লাগল, বাতাসে ধুলোর মত তুষারকণা উড়ছিল। দেশপ্রেমের অভিযানে অদম্য উৎসাহী ছাত্রদের নিয়ে আমি প্রচণ্ড গতিতে ছুটে চলেছি।



তারপর হঠাৎ দেখি রাস্তার সামনে একটা ভাঙন, কয়েকটা লাইন নেই। আর আধ মিনিটের মধ্যেই আমি ভাঙনের কাছে পৌঁছে যেতাম এবং একটা অকল্পনীয় সর্বনাশ ঘটে যেত। আমি মরলে কিছু হত না, কিন্তু ছাত্রদের কী হতো! তাদের অল্প বয়সের শরীরগুলো মাটির তলায় চাপা পড়ত, সমস্ত উৎসাহ বিলীন হয়ে যেতো। কী করে আমি ঐ করুণ দৃশ্য সহ্য করতাম। "হু—উ—উ—" প্রচণ্ড সতর্কতায় সমস্ত শক্তি দিয়ে আমি ডেকে উঠলাম। কিন্তু আমি অসহায়, নিজে কী করে ট্রেন থামাবো।

তারপর, হঠাৎ ঠিক সময়ে লম্বা, শক্তসমর্থ একটি ছাত্র তাড়াতাড়ি ব্রেক কষে দিল। ভাঙন থেকে কয়েক ফুট দূরে এসে আমি থেমে গেলাম। আমি হালকা হলাম। কিন্তু হাঁপিয়ে উঠলাম।

আমার ডাক বুঝতে পেরে কিছু ছাত্র দেখবার জন্য ট্রেন থেকে নেমে পড়লো। কনকনে শীত। অন্ধকারে তাদের শরীর তুষারে ঢাকা পড়ে যাচ্ছিল কিন্তু ওরা গ্রাহ্যই করছিল না। আমার চোখের আলোয় তারা দেখতে পেল যে রেললাইনগুলো সরিয়ে ফেলা হয়েছে। কিন্তু সেগুলোকে কাছাকাছি কোথাও দেখা গেল না। কোথায় সেগুলো লুকিয়ে রাখা হয়েছে?

"চালককে যেমন খুঁজেছি, লাইনগুলোকেও তেমনি খুঁজে দেখা যাক।" —একজন পরামর্শ দিল। সঙ্গে সঙ্গে ছাত্ররা লাইনের দুদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ব্রতচারীর মতো তারা কিছুটা পথ দৌড়োল, আবার থেমে চারদিক দেখে নিল, কিন্তু আধ ঘণ্টা ধরে তারা কিছুই দেখতে পেল না।

তারপর ছোট্ট নদীর পার থেকে উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল "এখানে আছে"। সমস্ত ছাত্ররা দ্রুতবেগে ঐ দিকে ছুটল। জলটা বরফ হয়ে গেছে। কিন্তু 'H' আকৃতির কিছু কালচে দাগ ওখানে বেরিয়ে আছে। ওগুলো রেল লাইন ছাড়া আর কি হতে পারে?

"লাইনগুলো দিয়ে আমরা রেলপথ মেরামত করতে পারবো"।

"এস সবাই, যারা রেলের যন্ত্রবিদ্যা পড়ছ। এসো, রেললাইন পাতার কিছু বাস্তব অভিজ্ঞতা হোক।"

"প্রথমে আমাদের জল থেকে লাইনগুলো বার করে আনতে হবে।" "আচ্ছা বেশ, ওগুলো বের করে আনা হোক", সবাই উঁচু গলায় সায় দিল। ওরা বরফ ভেঙে ভিতর থেকে লাইনগুলোকে এক এক করে বার করে আনল। বরফের জল ওদের জুতো মোজায় ছিটকে পড়ল। পা এবং পায়ের পাতার হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিল। ওরা কিছুই মনে করল না। বরং হাতে হাতে জল থেকে লাইনগুলো বার করে বয়ে আনার সময় ওরা 'পথ তৈরীর' গান ধরল।

কে আমাদের পথ আটকে বাধা দিয়েছে?
কে আমাদের বাধা দিয়ে পথ ঘিরেছে?
দুঃখ করো না, পিছিয়ে এসো না, বলো না, বলো না পথ চলা বড় কঠিন;
দুঃখ কান্না বাধা দূর করবে না।

শক্ত হও!
মনের জোরে আর শক্তিতে তৈরী করো নিজেকে
জ্বালিয়ে রাখো
মাটির তলায় ডিনামাইট।

বুম! বুম! বুম!
মাটি কাঁপছে
পর্বত ভাঙছে
ধ্বসছে পাহাড়

পথ খুলেছে
কাজে চলো,
বুক চিতিয়ে
চলো একসাথে

পথ তৈরীর আমরা দিশারী
খুলব আমরা সবার পথ
বুম! বুম! বুম!
হা, হা, হা……বুম!

তুষারকণা ওদের মুখগুলোকে ক্ষুরের মতো কেটে দিয়েছে। ঠাণ্ডা বাতাস সহস্র তীরের মতো ওদের শরীরে বিঁধে যাচ্ছিল। কিন্তু কিছুই তারা নজর দিচ্ছে না! কাঠের উপর লাইন পাততে গিয়ে তারা দেখল পেরেক নেই। কিছু ছাত্র চীৎকার করে বলল: "আমাদের পেরেক খুঁজতে হবে"।

"সম্ভবত ওগুলো সব জলে আছে। চল ফিরে গিয়ে ওগুলো তুলে আনি।" এক এক করে ছাত্ররা বরফের জলে লাফিয়ে পড়ে পেরেক খুঁজতে লাগল। "এখানে একটা" একজন ছাত্র চেঁচিয়ে উঠল। "আমিও একটা পেয়েছি" আর একজন বলে উঠল। প্রত্যেকটা পেরেকের সন্ধানকে অভিনন্দন জানানো হলো।

এখন কিন্তু আমার মন কিছুটা শক্ত। সহজে আমি কাঁদি না। কিন্তু ঐ তুষারের রাত্রে যখন আমি "জেলেদের" দেখলাম, আমি এতই অভিভূত হলাম যে আমার বিরাট চোখের জল আটকে রাখতে পারলাম না।

পেরেক খুঁজে লাইন মেরামতের পর আমি আবার ছাত্রদের নিয়ে যাত্রা করলাম। এইবার কিন্তু ভারপ্রাপ্ত ছাত্ররা আমাকে অত জোরে ছুটতে দেবে না। আমার চোখের আলোয় সামনের দিকে ওরা নজর রাখছিল যাতে কিছু গণ্ডগোল না হয়। ওদের সতর্কতা নিশ্চিতভাবেই আমার কাছে প্রশংসাযোগ্য। ছাত্ররা আরও কিছু রেললাইন নিখোঁজ হওয়ার সন্ধান পেল। আমরা আধঘণ্টারও বেশী সময় চলতে পারলাম না। আমি গাড়ী থামিয়ে দিলাম। ছাত্ররা নেমে গিয়ে হারানো রেললাইন খোঁজ করতে লাগল। কিন্তু এবারে যথাসাধ্য খোঁজ করেও তারা কিছুই দেখতে পেল না। বিস্তারিত আলোচনার পর তারা সিদ্ধান্ত নিল: সামনের ভাঙন মেরামত করবার জন্য পিছনের রেললাইন কাজে লাগাতে হবে।

খুব তাড়াতাড়ি এই জরুরী রেলকর্মীবাহিনী ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কেউ পিছন থেকে লাইন আনতে লাগল। কেউ সেগুলি চালান দিল, কেউ বা জায়গামত সেগুলি পেতে দিল। অন্যরা পেরেক বসিয়ে দিল। কাজের সময় তাদের "হাই-ও, হাই-ও" গানের সুরে একযোগে হাতুড়ির শব্দ মিশে যাচ্ছিল। কিছুক্ষণ বাদে তারা পুনরায় 'পথ তৈরীর' গান গাইতে আরম্ভ করল :

... ...

ধ্বসছে পাহাড়

পথ খুলেছে

কাজে চলো

বুক চিতিয়ে

চলো একসাথে

পথ তৈরীর আমরা দিশারী

আমরা খুলব সবার পথ

বুম! বুম! বুম!

হা, হা, হা...বুম!

অবশেষে ভোর হল। তুষারঝড় কমে এল। ঠাণ্ডা রূপোলী পরিবেশ। ফিকে নীল আলোর সকাল। এই জরুরী রেলকর্মীরা এতই মনোবল ও উৎসাহ নিয়ে কাজ করছিল যে তাদের কখনো চোখ পিটপিট করতে দেখা যায় নি। তাদের দিকে তাকিয়ে আমার বলতে ইচ্ছে হল :

যতক্ষণ তোমরা রেলপথ মেরামতের কাজ করবে তোমাদের পথের সমস্ত বাধা শরতের ঝরা পাতার মত সরে সরে যাবে। আমি নিশ্চিত বলতে পারি যে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত হলেও আমি তোমাদের গন্তব্যস্থলে নিয়ে যাবো। অন্যত্রও হয়ত তোমরা যেতে চাইতে পার, আমি তোমাদের কাজের জন্যই আছি। যেখানে তোমাদের ইচ্ছে, আর যেখানেই রেলপথ যাক, আমি তোমাদের নিয়ে যেতে প্রস্তুত।

মনে হল আমার কথা ওরা বুঝতে পেরেছে। তারা গান গেয়ে উত্তর দিল :

পথ তৈরীর আমরা দিশারী

আমরা খুলব সবার পথ

বুম! বুম! বুম!

হা, হা, হা,......বুম!



তিনটি অহঙ্কারী বিড়ালছানা

ইয়েন ওয়েন চিং

একছিল পুষি বিড়াল। তার তিনটে বাচ্চা। বড়টা মেয়ে—তার নাম বিন্দু, মেজোটা ছেলে—তার নাম বাদামী, আর ছোটটাও ছেলে—তার নাম কালু। অন্য সব মায়ের মতই মা পুষি বিড়াল তার বাচ্চাদের খুব ভালবাসত। সে বাচ্চাদের উপর সব সময় সতর্ক নজর রেখে তাদের যত্নের সঙ্গে বড় করে তুলল। এবং যখন তারা একটু বড় হল তখন তাদের স্কুলে ভর্তি করে দিল। তিনটে বাচ্চা একই ক্লাসে ভর্তি হল।

খুব আনন্দের সঙ্গে তারা বিড়ালদের ভাষায় পড়াশুনো করতে লাগল। গায়ে গতরেও বেশ তাগড়া আর শক্ত হয়ে উঠল। এবং যখন গ্রীষ্মের ছুটি হল তখন তারা খুশী খুশী মনে বাড়ীতে মায়ের কাছে ফিরে এল।

মা পুষি বিড়ালের বড় জানতে ইচ্ছে হল তার বাচ্চারা স্কুলে কেমন পড়াশুনো করছে। একদিন সকালে জলখাবার খাওয়ার সময়ে সে বাচ্চাদের জিজ্ঞেস করল—'বাচ্চারা, তোমরা কি লক্ষ্মী হয়ে স্কুলে পড়াশুনো করছ?'

সকালের জলখাবার খুব তৃপ্তি করে খেয়ে তিনটে বিড়াল ছানার ছোট্ট পেট বেশ নাদুস হয়ে উঠেছিল। খুব খুশী খুশী লাগছিল তাদের। তারা চোখ কুঁচকে একবাক্যে গর্বের সংগে উত্তর দিল—'হ্যাঁ মা আমরা ওখানে খুব ভাল পড়াশুনো করছি।'

বাদামী সব সময় অন্যদের চেয়ে একটু এগিয়ে কথা বলার চেষ্টা করে। সে বলল—'আমরা ওখানে গাদা গাদা বই পড়ছি।'

বিন্দু বলল—'আমরা গান গাই, ছবি আঁকি।' কালু তার সঙ্গে জুড়ে দিল—'এবং আমরা ব্যায়ামও করি। ওঃ, আমাদের স্কুলে আমরা সব কিছুই পাই।'

বাদামী আনন্দের সঙ্গে আবার বলল—'আমরা যদি এইভাবে পড়াশুনো করি তাহলে পৃথিবীর সবকিছুই আমরা জেনে ফেলব।'

বিন্দু বলল—'কি মজা আমরা কতো জ্ঞানী হয়ে যাব।'

—'যতটা জ্ঞানী হওয়া সম্ভব—ততটা জ্ঞানীই আমরা হব।' কালু গর্বের সঙ্গে দিদিকে সমর্থন করল।

মা পুষি বিড়াল এসব শুনে খুব খুশী। কিন্তু সেই সঙ্গে সে ভাবল বাচ্চারা সত্যি কথা বলছে কিনা এটা পরখ করে দেখা দরকার। সে বলল—'আচ্ছা, তোমরা যখন বড় হবে তখন তোমাদের অত জ্ঞান নিয়ে তোমরা কি করবে?'

—'খুব সম্ভব—না, আমি সে বিষয়ে এখনও কিছু চিন্তা করিনি।' বিন্দু বলল।

—'যখন আমি একজন কেউকেটা হয়ে উঠব তখন যে কোন কাজই আমি করতে পারব।' কালু বলল।

বাদামী খানিকটা চিন্তা করে বলল—'জ্ঞানই হল সব কিছু। যেহেতু আমাদের জ্ঞান আছে লোকে সেজন্য আমাদের সম্মান করবে। আমাদের আবার কাজ করার কি দরকার? আমরা গাদাগাদা বই পড়ছি। বড় হয়েও আমরা স্কুলে গিয়ে বই পড়ব।'

এবার মা পুষি বিড়াল কাজকর্ম করার মধ্যে জীবনের যে আনন্দ, যে সার্থকতা রয়েছে সে বিষয়ে বিশেষ ভাবে চিন্তা করল। কিন্তু তার কোন বাচ্চাই এ বিষয়ে কিছুই বলেনি। সেজন্যে সে আবার প্রশ্ন করল—'আচ্ছা, তোমাদের শিক্ষকেরা শ্রমের ব্যাপারে—মানে কাজকর্ম খাটাখাটনি করার ব্যাপারে কি তোমাদের কিছু বলেছেন?'

শ্রম? হ্যাঁ, মাষ্টার মশাই এ বিষয়ে বলেছিলেন বটে। কিন্তু সত্যি বলতে কি বাচ্চারা কেউই এ বিষয়টা মনোযোগ দিয়ে শোনেনি। তবুও তিনটে অহঙ্কারী বিড়ালছানা মায়ের প্রশ্নতে একটুও পিছু হটল না। তারা তাদের মাকে তৎক্ষণাৎই জবাব দিল।

বাদামীই প্রথমে কথা বলল—'ও হ্যাঁ মা, আমি জানি কিভাবে শ্রম শব্দটা বানান করতে হয়। আমি এটা পড়তে পারি। শ্র—ম।'

কালু বলল—'আমি এটা নিজেই লিখতে পারি।'

—'আমিও পারি'। বিন্দু বলল।

মা পুষি বিড়াল বুঝতে পারল তার অহংকারী বাচ্চাদের মধ্যে কোথাও

কিছু একটা গণ্ডগোল আছে। সে খুব দুর্ভাবনায় পড়ল এই ভেবে যে শব্দটার আসল মানেটা সম্বন্ধে বাচ্চাদের কোন ধারণাই নেই। সে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হবার জন্যে আবার প্রশ্ন করল—আচ্ছা সোনামনিরা, তোমাদের মধ্যে কেউ কি শ্রমের ভালমন্দ সম্পর্কে আমাকে বুঝিয়ে বলতে পারো? শুধু পড়তে জানা অথবা লিখতে পারাটাই তো সব নয়।'

এবার বাদামী মুখ খুলল না। বিন্দু মাথাটাকে এক পাশে হেলিয়ে আনমনে বলল—'মাষ্টারমশাই বড় তাড়াতাড়ি কথা বলেন। আমি ঠিকমত তার কথা বুঝতে পারিনা।'

—'এটা বোঝা এমন কিছুই শক্ত নয়।' কালু বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করল—'এটা খানিকটা ব্যায়াম করার মতন—না মা? অথবা এটা হয়ত……'

মা পুষি বিড়াল এবার বুঝতে পারল যে তার বাচ্চারা সত্যি সত্যিই স্কুলে ভালভাবে পড়াশুনো করছে না। সে খুব ভয় পেল যে বাচ্চাদের মাথায় সবকিছুই তালগোল পাকিয়ে গিয়েছে। সে চিন্তা করল—তাকে এমন একটা পথ খুঁজে বের করতে হবে যাতে এই ছুটির সময়ে তারা তাদের শেখার কাজ ঠিকভাবে চালিয়ে যেতে পারে। সে ঠিক করল—প্রথমে ঐ শ্রম দিয়েই সে শুরু করবে।

—'আচ্ছা বাছারা তোমরা সকলেই তো মাছ খেতে খুব ভালবাস—তাই না?'

—'নিশ্চয়ই, কেন?' বাদামী মায়ের প্রশ্ন শুনে খুব মজা পেল। 'আমি একসঙ্গে তিনটে ছোট নোনা মাছ খেতে পারি।'

—'আমি অতটা খেতে পারি না।' বিন্দু বলল—'অতটা খেলে আমি অন্য খাবার আর খেতে পারব না। আমার পক্ষে দুটো মাছই যথেষ্ট।'

কিন্তু ছোট্ট কালু চেঁচিয়ে বলল—'ও, তুই একটা কি রে? আমি তো পেলে পাঁচটা মাছ খেতে পারি।'

—'অবুঝ বাছারা'। মা পুষি বিড়াল বলল। 'মাছ খেতে পারাটা এমন কিছু বড় কাজ নয়। মাছ ধরতে পারাটাই হল আসল কাজ। আমি মনে করি তোমাদের কোন না কোন ধরনের কাজ করা অর্থাৎ শ্রম করা উচিৎ। আজকেই তোমরা কয়েকটা মাছ ধরার চেষ্টা করো। যদি তোমরা ধরতে পার তাহলে রাতে আমরা সবাই মাছ খেতে পাব। তাছাড়া আমি দেখতে চাই তোমরা যে যতটা পার—কাজ করো।'

বাদামী বুঝতে পারছিল না তার মা ঠিক কি করতে চাইছে। সে অবুঝের ত বলল—'ও, মাছ ধরা? এ তো সহজ ব্যাপার।'

—'আমিও মনে করি না এটা এমন কিছু কষ্টের কাজ।' বিন্দু বলল। 'কিন্তু মা আমরা তো খুবই ছোট এখনো—একেবারে শিশু। আমরা কেন আমাদের নিজেদের খাবার মাছ নিজেরা ধরব!'

কালু একথা মানতে পারল না যে, কোন কাজ করার পক্ষে সে খুবই ছোট। সে বলল—'ফুঃ, আমরা এমন কিছু ছোট নই। ঠিক আছে, আমরা কাজে যাব এবং মাছ ধরব।'

এইভাবে খানিকটা অবুঝের মত তিনটে অহঙ্কারী বিড়ালছানা কিছু কাজ করতে রাজী হয়ে গেল। তারা যে কতো চালাক এটা দেখিয়ে দেবার জন্যে তিনজনে তক্ষুনি বেড়িয়ে পড়ল। কিন্তু তারা নিজেদের চালাক ভেবেই খুশী থাকল। নিজেদের মাথাটা খাটাবার কথাটা একবারও ভেবে দেখল না। এমনকি কোন উপদেশও চাইল না মায়ের কাছ থেকে। যাবার সময় নিজেদের খাবা ছাড়া আর কোন মাছ ধরার সরঞ্জাম সঙ্গে নিল না।

কিন্তু কোথায় তারা মাছ পাবে? তারা অনেকটা পথ ঘুরে মাছের একটা ছায়াও কিন্তু দেখতে পেলনা। সুতরাং একসময় তারা একে অপরের গায়ে মাথা রেখে বসে পড়ল। বাদামীর অস্পষ্ট ভাবে মনে হল সে যেন কোন একটা বইতে পড়েছিল যে মাছ নদীতে অথবা হ্রদে কিংবা সমুদ্রে বাস করে।

কিন্তু কেমন ভাবে তারা নদী, হ্রদ বা সমুদ্র খুঁজে পাবে? তারা এর আগে কখনো বাড়ী থেকে এতদূরে আসেনি। নদী, হ্রদ বা সমুদ্র কিছুই দেখেনি। এ সবের যে কোন একটাকে খুঁজে পাবার জন্যে কোন পথই তারা ঠিক করতে পারল না।

সুতরাং যতক্ষণ তাদের খিদে না পেল আর তারা ক্লান্ত না হয়ে পড়ল ততক্ষণ তারা খুঁজেই চলল। অবশেষে তারা একটা পাহাড়ের পাশে একটা ছোট্ট নদীর কাছে এল।

—'হুর্‌রে।' বাদামী চেঁচিয়ে উঠল—'একটা নদী। আমরা একটা নদী খুঁজে পেয়েছি।'

—'তুই খুব চালাক রে।' বিন্দু বলল। 'এটা নিশ্চয়ই একটা নদী। এটা হ্রদও না, সমুদ্দুরও না। আচ্ছা আমরা এর মধ্যে কোন মাছ দেখতে পাচ্ছিনা কেন?'

কালু এক মুহূর্তের জন্যে নদীর দিকে তাকিয়ে বলল—'মাছ নেই তো ভালই হয়েছে। যদি মাছ থাকতও তাহলে কিভাবে আমরা তা ধরতাম!'

তিনটে অবুঝ বিড়ালছানা সেই ছোট্ট নদীর ধারে বোকার মতন দাঁড়িয়ে রইল। তারা চিন্তাই করতে পারল না এর পর তাদের কি করা উচিৎ।

যেখানটায় তারা দাঁড়িয়েছিল সে জায়গাটা ভারী সুন্দর। পরিষ্কার জল বয়ে চলেছে ছোট্ট নদীতে। কাছেই সবুজ মাঠে নানা রঙের ফুল ফুটে আছে। একটু দূরে একটা গাছ যেন তার হাতের মত শাখাপ্রশাখা ছড়িয়ে দিয়েছে। মৃদুমন্দ বাতাস বইছে আর সে বাতাসে ভেসে আসছে বুনো ফুলের গন্ধ। কিন্তু প্রকৃতির রূপের এই মাধুর্য উপভোগ করার মতন মনের অবস্থা তিনটে বিড়াল ছানার একেবারেই ছিল না।

—'আয়, এখানটায় বসে একটু অপেক্ষা করি। এই নদীতে নিশ্চয়ই মাছ আছে।' বিন্দু ভাইদের বলল।

—'হ্যাঁ, যখনই মাছ আসবে আমরা সঙ্গে সঙ্গে জলে ঝাঁপিয়ে মাছ ধরব।' কালু বলল।

—'ঠিক আছে।' বাদামী বলল—'আয় বসে খানিকটা অপেক্ষা করে দেখি।'

ওরা এতই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল যে মাছ দেখতে পাওয়া যাক বা না যাক শুধু একটু জিরিয়ে নেবার জন্যেও তাদের বসার দরকার ছিল। তারা সূর্যের আলোয় ঝলমলিয়ে ওঠা নদীর স্রোতের দিকে তাকিয়ে রইল। থাকতে থাকতে তাদের চোখ ধাঁধিয়ে গেল। কিন্তু মাছের কোন চিহ্নও তারা দেখতে পেল না।

অনেক সময় কেটে গেল। তিনটে অহংকারী বিড়ালছানা খিদেয় ক্লান্তিতে নিজেদের জন্যে খুব দুঃখ পেতে শুরু করল।

বাদামী দুচোখ বন্ধ করে খুব দুঃখের সুরে মিঁউ মিঁউ করে বলল—

—'আমাদের মতন ছোটদের পক্ষে মাকে ছেড়ে মাছ ধরতে আসাটা কি ভয়ংকর বলতো?'

কালু বলল—'আমি এই শ্রম করাটাকে কিছু বিশেষ ব্যাপার বলে মনে করি না।'

বিন্দু বলল—'যদি খুব তাড়াতাড়ি একটা মাছ না দেখতে পাই তাহলে আমার মনে হচ্ছে আমি কেঁদে ফেলব।'

এমন সময় হল কি—একটা বুড়ো ইঁদুর নদীর ওপারে বনের মধ্যে থাকত।

সত্যি বলতে কি, মা পুষি বেড়ালের ভয়েই সে শহর ছেড়ে পালিয়ে সেখানে এসেছিল। ইঁদুরটা অলসভাবে একটা গাছের নীচে ঝিমোচ্ছিল। বিড়াল-ছানাদের কথাবার্তায় তার সে ঝিমুনি ছুটে গেল। বিড়ালদের গলা শুনে সে প্রথমটায় ভয় পেয়ে ছুটে একটা গাছের পেছনে গিয়ে বিড়ালছানাদের কথাবার্তা শোনবার চেষ্টা করল। খুব শিগগিরই সে বুঝল যে বিড়ালছানারা নিতান্তই অবুঝ শিশু। তার ভয় কেটে গেল। সে তখন বিড়াল ছানাদের সঙ্গে চালাকি করার জন্যে একটা মতলব ভাঁজতে শুরু করল। আসলে সে চাইছিল মা পুষি বিড়ালের পরিকল্পনাকে ভেস্তে দিতে। কারণ কথামত যদি ঐ বিড়াল ছানারা কর্মঠ আর চালাক হয়ে ওঠে তাহলে সেটা সমগ্র ইঁদুর জাতির পক্ষেই অকল্যাণকর হবে। বুড়ো ইঁদুরটা ছিল বদবুদ্ধিতে একেবারে পাকাপোক্ত। সে চিন্তাভাবনা করে একটা মতলব এঁটে ফেলল।

খিদেয় কাতর বিড়ালছানারা দেখল তাদের চিন্তা ভাবনা তখন শুধু বাড়ীতে খাবারের থালার দিকে। কালু বলল, 'সে এখন একসঙ্গে ছ'টা মাছ খেতে পারে।'

—'বলে যা।' বলল বাদামী। 'ছটা কিছুই নয়। আমি এখন সাতটা খেতে পারি। কিন্তু কোথায় মাছ ? কখন মাছেরা আসবে ?'

—'মাছ খেতে খুবই ভাল—কিন্তু মাছ ধরাটা বড্ড জঘন্য ব্যাপার।' কালু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল। 'এটা অঙ্ক কষার চেয়েও খারাপ ব্যাপার।'

—'এই মাছ ধরার চেয়ে পরীক্ষায় অল্প নম্বর পাওয়াও ভাল।' বিন্দু দুঃখের সঙ্গে বলল—'মাকে ছেড়ে এভাবে চলে আসাটা মোটেই ঠিক হয়নি। বাচ্চারা কেন মিছিমিছি শ্রম করা শিখবে ? তাছাড়া আমি মনে করি না যে যেহেতু আমরা কাজ করতে জানিনা সেজন্যে আমরা একেবারে কিছুই জানিনা।'

—'ঠিক বলেছ।'

হঠাৎ ওরা নদীর ওপার থেকে আসা একটা চিঁ চিঁ সুরের আওয়াজ শুনল। ওরা তাকিয়ে দেখল একটা ধূসর রঙের প্রাণী একটা গাছের নীচে বসে ওদের কথায় সায় দিচ্ছে। সত্যি বলতে কি বিড়ালছানারা এর আগে ইঁদুর দেখেনি, সুতরাং তারা বন্ধুর মতো ইঁদুরটাকে জিজ্ঞেস করল—'কে আপনি ?'

—'আমি একজন খুব বিদ্বান লোক। আমি তোমাদের কথাবার্তা বেশ উপভোগ করছিলাম। অবাক হয়ে ভাবছিলাম এই সব চালাক চতুর ছেলেমেয়েরা কোথা থেকে এসেছে। আমি ঠিক জানি—তোমরা নিশ্চয়ই খুব ভাল ছাত্র।'

তিনটে অবুঝ ছোট্ট বিড়ালছানা এ কথা শুনে খুব খুশী হল। এবং বুড়ো ইঁদুরকে নদীর এপারে ওদের কাছে আসতে বলল। কিন্তু বুড়ো ইঁদুর মাথা নেড়ে বলল—'না না, আমি একজন বুড়ো লোক। চলা ফেরা করতে আমার একদম ভাল লাগে না। তোমরাও তো খুব ক্লান্ত দেখতে পাচ্ছি। আমার ওদিকে যাওয়ার বা তোমাদের এ দিকে আসার কোন দরকার নেই। আমরা এভাবেই কথাবার্তা চালাতে পারি। তোমরা যা বলছিলে তা খুবই সত্যি কথা। এই আমাকেই ছ্যাখোনা, একজন বিদ্বান লোক হিসেবে আমাকে কোন কাজ করতে হয় না। যারা কাজ করে না তারা কখনই বোকা লোক নয়—উল্টে তারাই হলো সবচেয়ে বুদ্ধিমান।'

—'আমাদের মা কিন্তু বলেন আমাদের অবশ্যই কিছু কাজ করা উচিৎ।' বিন্দু বলল।

বুড়ো ইঁদুর গোঁফে তা দিয়ে বলল—'কাজ করা উচিৎ তোমাদের? ছি ছি —যতো সব আজগুবি কথাবার্তা। প্রথমেই ধরো, যদি তোমাদের কাজ করতে হয় তাহলে তোমাদের হাত দুটো তো অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে। তাই না? আচ্ছা বলো, তাহলে কি তোমরা ক্লান্ত হয়ে পড়বে না?'

—'যখন আমি ব্যায়াম করি তখন কিন্তু আমি মোটেও ক্লান্তি বোধ করি না।' কালু বলল—'অথচ দেখুন, আজ আমি কাজ করতে এসে এর মধ্যেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।'

—'তাহলে বোঝো, আমি কতটা ঠিক কথা বলছি।' মুখ টিপে হেসে ইঁদুরটা বলল। নিজের চালাকিতে সে নিজের উপর এতই খুশী হয়ে উঠল যে প্রায় নদী পার হয়ে বিড়ালছানাদের কাছে চলে যাচ্ছিল। কিন্তু সময় থাকতে সে নিজেকে সামলে নিল। সে কালুকে বলল—'তুমি সত্যিই খুব চালাক। তারপর যা বলছিলাম—কাজ করা অর্থাৎ পরিশ্রম তোমাকে নোংরা করবে। দেখ যদি তুমি বালিতে লাফাও তাহলে গায়ে বালি লেগে কি বিচ্ছিরি নোংরা হয়ে যাবে না?'

—'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আমি নোংরা খুবই অপছন্দ করি।' বিন্দু বলল—'আজ এই বাতাস আর ধুলো ময়লা আমার সবুজ ফিতেটাকে কি নোংরা করেছে দেখুন না।'

—'ছি ছি ছি।' ইঁদুরটা বলল—'তোমরা কত সুন্দর ছোট্ট বিড়ালছানা —তোমাদের এই দশা।'

কালু কিন্তু ইঁদুরের কথা মেনে নিল না। সে বলল—'দেখুন, যখন আমি লং জাম্প প্র্যাকটিশ করি তখন ধুলো মাখতে মোটেই খারাপ লাগে না।'

—'তা হয়ত লাগে না।' ইঁদুরটা চতুরভাবে বলল—'কিন্তু যদি তুমি কেবল বালিতে মাছ ধরার জন্যেই ধুলো মাখো তাহলে?'

—'আমি কখনোই তা করিনা।'

ইঁদুর মাথা নেড়ে বলল—'তাহলেই বলো, বালিতে মাছ ধরা অত্যন্ত নোংরা কাজ কিনা? তাইতো বলছি কাজ করা মোটেই ভাল নয়।'

—'কিন্তু আমাদের বইতে এটা তো লেখা নেই যে মাছ বালিতে পাওয়া যায়!' বাদামী আশ্চর্য হয়ে বলল।



ইঁদুরটা আড়চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলল—'তুমি কী চালাক ছেলে। তোমার বইতে না হয় লেখেনি। কিন্তু আমি যে বই পড়েছি তাতে লিখেছে যে মাছ বালিতে পাওয়া যায়। যাই হোক এ জন্যে আমাদের তর্ক করার দরকার নেই। কারণ আমরা তো এর আগেই মেনে নিয়েছি যে মাছ ধরা

ভাল কাজ নয়। তাছাড়া কঠিন পরিশ্রমে সম্মানও থাকে না। সৌখীন ফুটফুটে বিড়ালছানারা নিজেদের খাবার জন্যে মাছ ধরবে আর মাছেরা তাদের নজরের মধ্যেও আসবে না এ কেমন কথা! এ বড়ই লজ্জার বিষয়। তোমরা নিশ্চয়ই এভাবে লজ্জায় পড়তে চাও না, চাও কি?'

—'অবশ্যই নয়।' বিন্দু বলল।

ইঁদুরটা নিজের বুদ্ধিতে নিজের উপর খুব সন্তুষ্ট হচ্ছিল আর বক বক করছিল। সে বলল—দু নম্বর কথা হলো, যদি তোমরা কাজ করো তাহলে তোমাদের কোন স্বাধীনতাই থাকবে না। এখন তোমরা স্বাধীন—কি তাই না? এখন তোমরা যদি বাড়ীতে থাকতে তাহলে এই গরমের দিনে তোমরা শুয়ে থাকতে। কিন্তু যদি তোমরা কাজ করতে বেরোও তাহলে তোমরা আর স্বাধীন থাকবে না। আর যে মাছ তোমরা ধরতে চাও তাও তোমাদের কাছে আসবে না। তিন নম্বর কথা অর্থাৎ আমার শেষ কথা হলো কাজ কেবল বোকারা করে। চালাক বাচ্চারা কখনো কাজ করে না। তাদের কেন মাছ ধরতে হবে। যদি তোমরা চালাক হও, তবে ঐ সব বোকা লোক যারা মাছ ধরে খায় তাদের মতো না হয়ে কাজ কম্ম না করেই তোমরা খেতে পাবে। এটা খানিকটা সেইসব ছাত্রদের মতো যারা একেবারে অংক না কষেই পরীক্ষায় বেশী পায় আর যারা দিনরাত্তির পড়াশুনো করেও গোল্লা খায়। বলো, আমি ঠিক বলছি কিনা।'

—'ঠিক, ঠিক বলেছেন।' তিনটে বিড়ালছানা একসঙ্গে বলে উঠল। ইঁদুরের এই সব যুক্তি শুনে তারা এতই খুশী হয়েছিল যে তারা আনন্দের মিঁউ মিঁউ শব্দ তুলে বলল—'ওঃ, আপনি কি চালাক, আপনি কি ভালো। আচ্ছা আপনার নামটা বলুন না।'

ইঁদুরটাও নিজের এই চালাকি বুদ্ধির সাফল্যে এতই খুশী যে কোন কিছু চিন্তাভাবনা না করেই সে জবাব দিতে যাচ্ছিল—'আমি হলাম গিয়ে মিষ্টার ইঁ...দু...।' কিন্তু পুরোটা বলে ফেলার আগেই সে নিজেকে সামলে নিল। বললো—'আমি? আমি কে? আমি হলাম গিয়ে বুদ্ধিমান মিষ্টার গুঁফো। একজন বিদ্বান বৃদ্ধলোক। চালাক ছেলেপুলেদের আচরণ ভালো হয়। তোমরা কি জানো না যে কারো ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে প্রশ্ন করতে নেই।'

—'চল বাড়ী যাই।' কালু বলল।

—'কিন্তু মাছ? আমরা মাছ কেমন করে পাব? মা যা বলেছে তা ভুলে

যাওয়া আমাদের মোটেই উচিৎ নয়। মা আমাদের কতো ভালবাসে।' বিন্দু ভাইদের বলল।

বাদামী ইঁদুরটাকে জিজ্ঞেস করল—'আচ্ছা মিষ্টার বুড়ো বিদ্বান, আপনি কি মনে করেন এই নদী থেকে আমরা কখনো মাছ ধরতে পারব? আমরা অনেকক্ষণ ধরেই তো অপেক্ষা করছি।'

ইঁদুরটা রাগের ভান করে বলল—'কি করে তুমি এই বোকার মতন প্রশ্নটা করলে? আমি ভাবছি তোমরা বুঝি চালাক। প্রথম কথা হলো আমি তোমাদের বলেইছি যে মাছ ধরার কোন প্রয়োজনই নেই। দ্বিতীয় কথা হলো আমি আমার জীবনে প্রচুর মাছ দেখেছি কিন্তু এমন কথা কখনো শুনিনি যে নদী থেকে মাছ ধরা যায়।'

—'তাহলে মাছেরা কোথায় থাকে?' কালু প্রশ্ন করল।

এবার ইঁদুরটা সত্যিই ক্ষেপে গেল। —'কেন খাবার আলমারীতে, ঝুড়িতে থাকে। তা সে ঝুড়ি দেয়ালের নীচে আছে কি উপরে আছে সেটা কোন ব্যাপার নয়। তুমি সহজেই তা থেকে মা পেতে পারো। এ ছাড়া রেফ্রিজারেটরেও মাছ পাওয়া যায়। তবে আমি স্বীকার করি যে সেখান থেকে মাছ পাওয়া একটু কষ্টকর কারণ তা ধাতু দিয়ে তৈরী তো।'

এসব শুনে তিনটে বিড়াল ছানা খুব অবাক হয়ে গেল। হঠাৎ বিন্দু বিচিত্র একটা গন্ধ পেল নাকে। তার মনে হল গন্ধটা যেন ঐ ইঁদুটার গা থেকেই আসছে। সে ফিসফিসিয়ে কালুকে বলল—'আমি কেমন যেন একটা গন্ধ পাচ্ছি রে?' কালু বলল—'আমিও পাচ্ছি। কিন্তু কিসের গন্ধ?'

ইঁদুরটা দেখল বিড়ালছানারা তাকে সন্দেহের চোখে দেখছে। সে তাড়াতাড়ি নিজেকে সংযত করে নিয়ে বলল—'মনে হচ্ছে তোমরা আমার কথা পছন্দ করছ না। তাহলে আমার চলে যাওয়াই ভাল। তাছাড়া আমি এখন ক্লান্ত, খুব ক্লান্ত। আমি এখন একটু জিরোতে চাই। আচ্ছা চলি।' বলে সে তাড়াতাড়ি বনের মধ্যে চলে গেল।

অগত্যা তিনটে বিড়ালছানা একটাও মাছ না নিয়েই খালি পেটে বাড়ী ফিরে গেল।

মা পুষি বিড়াল তাদের জন্যে রাতের খাবার তৈরীই রেখেছিল। সে আগেই জানত বাচ্চারা নিশ্চয়ই একটাও মাছ পাবে না। রাতের খাবার খাওয়ার পর তারা তাদের সব অভিজ্ঞতার কথা মাকে বলল।

তা শুনে মা পুষি বিড়াল হেসে বলল—'হায়রে আমার অহঙ্কারী ছেলেমেয়েরা, তোমরা ভেবে বসে আছ যে তোমরা এক একজন কেউকেটা হয়ে গেছ। শ্রমকে তোমরা অবজ্ঞা করো। ছিঃ তোমাদের আর ঐ গুঁফো ভদ্রলোকের জন্য আমার লজ্জা হয়। তোমরা একটা ঘৃণ্য ইঁদুরের সঙ্গে কথা বলে এসেছ। তোমরা [illegible] তো ধরতেই পারোনি উল্টে একটা ইঁদুরের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে তার উপদেশ শুনে এসেছ। ওঃ কি অবুঝ তোমরা।'

তিনটে বড়াল ছানার কান এ কথা শুনে লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। (যদিও তোমরা তা দেখতে পাবে না কারণ বিড়ালদের মুখ লোমে ঢাকা থাকে।) তারা বুঝল যে তারা ভুল করেছে। বইয়ের শিক্ষার বাইরেও যে অনেক শেখার জিনিষ এই পৃথিবীতে রয়েছে এটা তারা বুঝতে পারল। তারা তাদের মাকে বলল—তাদের সঙ্গে নিয়ে একদিন কিভাবে মাছ ধরতে হয় তা দেখিয়ে দিতে।

তারপর থেকে তারা মাছ ধরা ছাড়াও আরো অনেক কিছুই শিখে ফেলল। তারা ক্রমশঃ বুদ্ধিমান, কর্মঠ আর সত্যিকারের চালাক বিড়ালছানা হয়ে উঠল।



জল-নিমগ্ন কারাগার থেকে

চেন সি-ইউয়ান ও লিউ চি কুই



পুরোণো সমাজে কয়েক পুরুষ ধরে আমার পরিবার লিউ নামে এক অত্যাচারী দুর্বৃত্ত জমিদারের প্রজা হিসেবে বাস করে আসছিল। এই জমিদারের আর এক নাম ছিল "নরকের রাজা"। এক বছর আমাদের ওখানে প্রচণ্ড খরা হয়। গাছপালা মাঠঘাট সব শুকিয়ে যায়। আমি ও আমার বাবা অক্লান্ত পরিশ্রম করে সেই মাঠে ফসল ফলাতে চেষ্টা করি। বলা যায় আমাদের শরীরের ঘাম ও চোখের জলে যে ফসল ফলে তাতে কোনমতে জমিদারের খাজনা দেওয়া যায়। নেকড়ের মতোই ভয়ংকর সেই জমিদার একদিন তার খাজনা চেয়ে পাঠায়। আমি ও আমার বাবা সমস্ত কষ্টকে বুকের মধ্যে চেপে রেখে আমাদের সারা বছরের ঘামে ভেজা ফসল নিয়ে সেই জমিদারের খাজনা আদায়ের কাছারীতে গিয়ে হাজির হলাম।

জমিদারের খাজনা আদায়ের কাছারীটা আসলে গরীব লোকেদের কাছে নরকের দরজা। ফসলের মান নির্ণয়, ঝাড়াই ও মাপ এই তিনটি পরীক্ষায় পাশ করা খুবই কঠিন। কিন্তু আমি ও বাবা কোনক্রমে এই তিনটিই পাশ করে গেলাম। তারপর যখন আমরা হিসাব-ঘরে গিয়ে পৌঁছলাম হিসাবরক্ষক তার মাপযন্ত্রের দিকে আঙুল তুলে চিৎকার করে বলে উঠল, "এখনও বারো লিটার কম!" আমরা দুজনেই হতবাক হয়ে গেলাম: "শোষণ! এ যে রীতিমত দিন দুপুরে ডাকাতি!"।

হিসাব রক্ষক শয়তানের হাসি হেসে উত্তর দিল: "বুঝলে হে হুয়াং রাজমিস্ত্রী, তুমি একটা কাজ করে এই ঘাটতি পুরণ করতে পারো। তুমি মহারাজার দামী জিনিসপত্তর রাখার জন্য একটা পাথরের ঘর তৈরী করে দাও, তাহলেই হবে।"

বাবা আর কি করেন, তিনি বাধ্য হলেন সেই প্রস্তাবে রাজী হতে। সারা বছরের ফসল তুলে দিয়েও বিনে পয়সায় ওদের গোলামী করতে হবে!

পাথরের ঘরটা করতে হবে একটা গোপন স্থানে। লিউ-র বুদ্ধ মন্দিরের পিছনে একটি জায়গায়। সম্পূর্ণ পাথরের চাংরা দিয়ে সেটা তৈরী করা হচ্ছে। হিসাব রক্ষক চাবুক হাতে বাবা ও অন্যান্য রাজমিস্ত্রীদের সারা দিনরাত কাজ করাচ্ছে। ওরা কাজ করতে করতে অবসাদে ভেঙে না পরা পর্যন্ত কাজ করতেই থাকেন।

কয়েকদিনের মধ্যেই বাবা বুঝতে পারলেন যে তারা ঘর বানাচ্ছেন না—বানাচ্ছেন জল-নিমগ্ন কারাগার। বাবা অবাক হয়ে গেলেন। তিনি তার অন্যান্য সহকর্মীদের গোপনে বললেন, "এই যে জল-নিমগ্ন কারাগারটা আমরা তৈরী করছি, এটা তো আসলে আমাদের মতো গরীবদেরই অত্যাচার করার জন্য। এটাই হবে এই পৃথিবীতে আমাদের নরক। এই কাজ আমাদের বন্ধ করতেই হবে।" ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে তারা সেই রাত্রেই পালাবার সিদ্ধান্ত নিলেন।

পালাতে চাইলে কি হবে? প্রহরী তাদেরকে ধরে ফেলল। বাবা কোনমতে পালিয়ে গেলেন। শোনা যায় যে অন্যান্যদের দিয়ে জোর করে সেই কারাগারটা তৈরী করানো হয়। এবং সেই নরকের রাজা লিউ তার জঘন্য নোংরা কাজ ধামা চাপা দেবার জন্য তাদের সকলকেই হত্যা করে।

বাবা বাড়িতে ফিরে আসেন। তিনি জানতেন যে জমিদার ক্ষান্ত হবে না। তাই তিনি ঠিক করলেন আমাদের সকলকে নিয়ে পালিয়ে যাবেন। কিন্তু হায়! আমরা সিদ্ধান্ত নেবার আগেই কুকুরের চিৎকার শোনা গেল। আর তারই পেছনে লিউর হিসাব রক্ষক ও অন্যান্য দালালেরা এসে হাজির হল। তারা দরজা ভেঙে বাড়ির ভেতরে ঢুকল। অকথ্য গালাগাল দিতে দিতে বাবাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে গেল।

মা আর আমি ছুটে গেলাম বাবাকে বাঁচাতে। আমি একটি দালালের হাত ভীষণ জোরে কামড়ে দিলাম। হঠাৎ কে যেন তার রাইফেলের কুঁদো দিয়ে আমার মাথায় মারল। আমার হাত অবশ হয়ে গেল এবং ওরা বাবাকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যেতে লাগল। আমি সম্বিত ফিরে পেয়ে একটা বাঁক তুলে নিয়ে ঐ শয়তানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

সেই শয়তান হিসাব রক্ষকটা একটা পিস্তল বার করল। মা ছুটে গিয়ে তার শরীর দিয়ে সেই পিস্তলের মুখ আটকে দিলেন। তিনি চিৎকার করে বললেন,

"সিয়েনইং! পালা! পারলে আমাদের হত্যার প্রতিশোধ নিস।" আমি একজন দালালকে বাঁক দিয়ে একটা আঘাত করে পালিয়ে গেলাম।

ছুটতে ছুটতে গ্রামের পাশের একটি বাঁশঝাড়ে ঢুকে পড়লাম। আর তখনই শুনলাম একটি গুলির শব্দ। আমি শব্দটার মানে বুঝতে পারলাম। লিউ আমার মাকে খুন করেছে। আমার দু চোখ ফেটে জল বেড়িয়ে এল। বুকে জ্বলে উঠল ঘৃণার আগুন। কিন্তু এখানে থাকলে ওরা আমাকেও ধরে ফেলবে। তাই আমি ছুটতে আরম্ভ করলাম…দূরে…আরও দূরে।

চারিদিকে অন্ধকার। আমাদের মতো গরীব লোকের বাঁচবার রাস্তা কোথায়? বেশ কয়েকটা দিন পথে পথে কাটালাম। গরীব লোকেরাই আমাকে তাদের সাধ্যমত সাহায্য করল। অবশেষে আমি লাই পাহাড়ের পাদদেশে এসে পৌছলাম। সেখানে হৌ নামে এক জমিদার ছিল। আমার অবস্থা তখন খুবই খারাপ। একটা আশ্রয় খুঁজে বার করতেই হবে। তাই আমি সেই জমিদারের বাড়িতেই একটা চাকরাণীর কাজ জোগার করে নিলাম। এ ছাড়া আমার বাঁচার আর কোন রাস্তাই ছিল না। তখন আমি মাত্র সতেরো বছরের একটি মেয়ে।

আমাদের একটা প্রবাদ আছে, "এই আকাশের সব কাকই কালো।" হৌও, নরকের রাজা লিউর মতোই একজন নোংরা নিষ্ঠুর লোক। সেই লোকটা কাক ডাকার আগেই আমাকে ঘুম থেকে তুলে দেয় এবং গভীর রাত পর্যন্ত খাটায়। সমস্ত পরিবারের ফাই ফরমাশ খাটতে হয় আমাকে। জল তোলা, বাসন মাজা, চাল ধোওয়া, রান্না করা। তার উপরে আবার পাহাড়ে উঠে জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করে আনতে হয়। মালবাহী পশুর চেয়েও অধমভাবে আমাকে ঐ শয়তানটা খাটিয়ে নেয়।

যখনই আমি পাহাড়ের চূড়ায় উঠতাম, আমি আমার বাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকতাম। আর ভাবতাম হায়, ওরা মাকে খুন করেছে। আমার বাবাকে নরকের রাজা লিউ জোর করে ধরে নিয়ে গেছে। কি জানি বাবা এখন কেমন আছেন! হে ভগবান! কবে এই ভয়ংকর দিন শেষ হবে!

তখন শীতকাল। একদিন আমি জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করতে পাহাড়ে উঠেছি। উঠেই আমার ভীষণ ক্ষিধে পেল আর খুব শীত করতে লাগল। কারণ, সকালে আমি কেবল একটা ছোট্ট পোড়া কেক খেয়েছিলাম। ওরা আমাকে ও রকমই খেতে দিত। আমার পিঠে তখন পঞ্চাশ কিলোরও বেশী ওজনের

জ্বালানী কাঠ। আমার পা অবশ হয়ে আসছিল, ভীষণ দুর্বল লাগছিল। আমার চোখের সামনে তারারা নেচে বেড়াচ্ছিল। আমি পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছে আর থাকতে পারলাম না। অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম। আমি পাহাড়ের কিনারেই পড়ে যাচ্ছিলাম, কিন্তু ঠিক সেই সময়েই একজন বৃদ্ধ লোক এসে আমায় ধরে ফেলেন। তিনি পাহাড়ে কাঠকয়লা তৈরী করেন।



তিনি আমাকে ধরে পাহাড় থেকে নামালেন। আমার কাঠের বোঝাটাও নামিয়ে দিলেন। তারপর আমার বাড়ির সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিলেন। আমার দুঃখের কাহিনী শুনে তিনি বললেন, "খুকী, এই ঘৃণা যেন তোর মন থেকে মুছে না যায়। চেয়ারম্যান মাও ও কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে লালফৌজ একবার এখানে এসেছিল। ওরা শীঘ্রই আবার আসবে। সেই দিন আর দূর নয় যখন গরীবেরা তাদের পিঠ সোজা করে দাঁড়াবে।" তার কথা শুনে আমার আনন্দ হল এবং আমি আবার শক্তি ফিরে পেলাম। আর আমি সেই লালফৌজের আসার দিন গুণতে লাগলাম।

আমি কখনও ভাবতে পারিনি যে হো নরকের রাজা লিউর আত্মীয় হতে পারে। কিন্তু বিপদ কখনও একা আসে না। তাই একদিন দেখলাম যে লিউর সেই হিসাব রক্ষক হোএর সাথে দেখা করতে এসেছে। আর সেও

আমাকে দেখে ফেলল এবং উল্লাসে চিৎকার করে উঠল, "আরে! তুই দেখছি আমাদের ছাড়তে পারলি না!" তারপর সেই জানোয়ারটা আরও কয়েকজনকে নিয়ে আমাকে বেঁধে ফেলল। এবং সেই রাত্রেই ওরা আমাকে লিউর বাড়িতে পাঠিয়ে দিল। সেখানে আমাকে বুদ্ধ মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হল। লিউ তার গোল গোল চোখ দুটো আধবোজা করে একটা উঁচু আর্ম চেয়ারে বসে আছে, আর তার হাতে রয়েছে জপমালা। হিসাব রক্ষক দাঁত কিরমির করে বলে উঠল, "আমাদের মহারাজ সদয় ও পরোপকারী। তিনি সর্বদা ন্যায় ও ধর্মের পক্ষে। কিন্তু তুই আর তোর বাপ ভালোকে খারাপ মূল্য দিয়েছিলি। তোরা লোককে বিদ্রোহে উস্কানী দিয়েছিস। আজ মহারাজের ক্রোধ কাকে বলে দেখবি!"

চরম শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়াতেই আমার রাগ দ্বিগুণ বেড়ে গেল। আমার মনে হচ্ছিল, ইস্, যদি আমি ছুটে গিয়ে ওকে হত্যা করতে পারতাম! আমি বললাম, "আপনি ন্যায় ও ধর্মের কথা বলছেন, কিন্তু আপনার হৃদয় কুৎসিত পাপে ভরা। আমাকে আটকান, হত্যা করুন। যা ইচ্ছে করুন।" এই কথাগুলো বলার সময় আমার ঠোঁটে হাসি ছিল কিন্তু আমার চোখ দুটো ছিল বরফের মতো শীতল।

আমার কথা শুনে সে তৎক্ষণাৎ রেগে উঠল। সে তার হাতের জপমালা একদিকে ছুঁড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল এবং তারপর চিৎকার করে বলে উঠল, "তোর বাপকে যেভাবে হত্যা করেছি তোকেও সেইভাবেই হত্যা করব।" এ কথা বলার সাথে সাথেই দুজন দুর্বৃত্ত নেকড়ের মতো আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাকে ভীষণ মার মারল। তারপর ওরা আমাকে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে গেল।

ওরা আমার চোখ বেঁধে একটা আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে নিয়ে গেল। একটা বাড়ির সামনে এসে আমরা থামলাম। ওরা দরজার তালা খুলল। আমার চোখের বাঁধন খুলে ওরা আমাকে ধাক্কা মেরে বরফ শীতল জলের মধ্যে ফেলে দিল। আমার বুকের মধ্যে রক্ত চলকে উঠল, "ওরা আমাকে জল-নিমগ্ন কারাগারে এনে ফেলেছে!"

কারাগারের মধ্যে দু ফুট গভীর জল। জলে রক্ত মিশে আছে। তাই পিচ্ছিল ও আঠালো। দুর্গন্ধে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। এই সেই জল-নিমগ্ন কারাগার! কে জানে কতজন শ্রেণী ভাই ও বোন এখানে মরেছে! তখনই আমার লিউএর কথাগুলো মনে পড়ল এবং আমি বুঝতে পারলাম আমার বাবাও এখানেই মরেছেন। নতুন ও পুরোনো ঘৃণায় আমার বুকটা ভরে গেল।

কয়েকদিন বাদে সেই হিসাব রক্ষক কারাগারের দরজার কাছে এসে দরজা

খুলে মুখটা ভেতরে ঢোকাল। সে যখন দেখল যে আমি তখনও মরিনি সে আরও নিষ্ঠুরতার সাথে বলে উঠল, "এই বেজম্মার বাচ্চা, দেখব তোর কত শক্তি!" আমি রাগে ফেটে পড়লাম এবং সেই নোংরা জল ছিটিয়ে ওকে ভিজিয়ে দিলাম। সে চিৎকার করে এক লাফে বেড়িয়ে গেল।

কিছুক্ষণ বাদেই শুঁয়োরটা আবার ফিরে এল। এবার সে তার সংগে নিয়ে এসেছে একটা পেরেক লাগানো লোহার খাঁচা। সংগে আরও কয়েকজন লোক রয়েছে, ওরা জোর করে আমাকে ঐ খাঁচার ভেতরে ঢুকিয়ে দিল। খাঁচাটা মাত্র চার ফুট উঁচু। স্নতরাং দাঁড়াতে গেলে বা বসতে গেলেই পেরেকের খোঁচা লাগে। আমার শরীরের ভেতরে পেরেক ঢুকে যায় এবং সেই ক্ষতস্থানে রক্তাক্ত জল এসে লাগে। তাতে এমন জ্বালা করে যে এর চেয়ে গায়ের চামড়া খুলে নিলেও বোধহয় কম লাগবে··· !

আমি যন্ত্রণায় সেই নরকের রাজা লিউ ও যে দস্যুর সমাজে আমি বাস করছি তাকে অভিশাপ দিতে লাগলাম। কিন্তু যখনই সেই বৃদ্ধ কাঠকয়লা প্রস্তুতকারীর কথা আমার মনে পড়ল, অমনি আমার শক্তি ফিরে এল। আমি তখন কারাগারের জানলার মতো ক্ষুদ্র ফাঁকটুকুর দিকে তাকালাম। আমার বুকের গভীর তল থেকে একটা চিৎকার বেড়িয়ে এল, "লালফৌজ! তাড়াতাড়ি এস। আমাদের মতো সকল গরীব ও নির্যাতিত মানুষকে উদ্ধার কর!"

অবশেষে সেই দিনটি এল। আমাদের ভাগ্যাকাশ থেকে কালো মেঘ সরে গেল এবং আবার সূর্যের আলো ফুটে উঠল! চেয়ারম্যান মাও ও কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে চীনের গণমুক্তি ফৌজ আমাদের সেচুয়ান প্রদেশ মুক্ত করল। আমাকে ওরা সেই জল-নিমগ্ন কারাগার থেকে উদ্ধার করল। আমি আবেগভরে গণমুক্তি ফৌজের লোকদের হাত চেপে ধরলাম। আমার দু চোখ বেয়ে তখন ঝরে পড়ছে আনন্দের অশ্রু!

তারপরের দিনগুলো কি দ্রুত কেটে যেতে লাগল। আমরা সবাই গণমুক্তি ফৌজের নির্দেশে কাজ করতে আরম্ভ করলাম। পার্টি ও সরকার আমাদের ভূমি সংস্কার সাধন করার জন্য পরিচালিত করল। আমরা সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হলাম। সেই দুর্বৃত্ত জমিদার, নরকের রাজা লিউকে খতম করা হল। চেয়ারম্যান মাও এর বিপ্লবী চিন্তাধারার পথনির্দেশে আমরা মুক্ত কৃষকেরা সমাজতন্ত্রের উজ্জ্বল পথে পাড়ি দিলাম। আমরা একটি নতুন সুখী জীবন যাপন করতে শুরু করলাম। পুরোণো সমাজ থেকে নতুন সমাজে জীবন কত পৃথক!

দাদু ও ভূতের গল্প

চি-ইউন



তাই তুং ইউয়ান বলেছিলেন যে যখন তার এক দাদু একটা ফাঁকা জায়গায় একটা বহুদিনের খালি পোড়ো বাড়ী ভাড়া করলেন তখন সবাই তাকে বলেছিল যে বাড়ীটা নাকি ভূতুড়ে। কিন্তু দাদু সোজাসুজি বলল—'ওসব ভূতটুতে আমি ভয় পাইনা।'

যখন রাত হল প্রদীপের টিমটিমে আলোয় ভূতের আবির্ভাব হল। এবং সেই সঙ্গে বিচ্ছিরি একটা ধোঁয়ায় হাড়ে কাঁপুনি ধরিয়ে দিল। একটা বিরাট ভূত বেশ রাগী গলায় তাকে বলল—'এখনো তুমি ভয় পাচ্ছ না?'

দাদু উত্তর দিল—'না।'

ভূতটা এবার ভয় দেখাবার জন্যে নানারকম ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করল এবং আবার জিজ্ঞেস করল—'এখনও ভয় পাচ্ছ না?'

দাদু আবারও উত্তর দিল—'না'।

এবার একটু নরম স্বরে ভূতটা বলল—'দেখো, আমি তোমাকে বাড়ী থেকে একেবারে বের করে দিতে চাইছি না। কিন্তু যে ভাবে তুমি সাহস দেখাচ্ছ সেটাও একেবারেই উচিত নয়। যদি তুমি একবার শুধু বল যে তুমি ভয় পেয়েছ—আমি কথা দিচ্ছি তাহলে আমি চলে যাব।'

একথা শুনে দাদুর মেজাজ একেবারে চড়ে গেল। সে বলল—'আরে আমি তো সত্যিই ভয় পাচ্ছি না। তবু কেন আমি তোমাকে খুশী করার জন্যে মিথ্যে বলতে যাব!'

ভূতটা তবুও বার বার অনুরোধ করতে লাগল। কিন্তু তাতে কোন ফলই হল না। অবশেষে একটা বিরাট দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভূতটা বলল—'তিরিশ বছরেরও

বেশী আমি এই বাড়ীতে আছি কিন্তু কখনো এমন কঠিন অবস্থায় পড়িনি। এমন একটা বোকা লোকের সঙ্গে আমি কিভাবে বাস করব!' বলে সে বাতাসে মিলিয়ে গেল।

একথা শুনে কিছু লোক দাদুকে বলেছিল ভূতকে ভয় পাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। এতে লজ্জার কিছুই নেই। যদি তুমি একবার শুধু ভয় পাওয়ার ভানও করতে তাহলে সব ব্যাপারটাই সহজ হত। এখন দু পক্ষই যদি এভাবে আক্রমণমুখী থাকো তাহলে কি ব্যাপারটা কখনো শেষ হবে?

দাদু জবাবে বলল—যার মনে খুব জোর আছে সে ধীরে সুস্থে ভূতকে সরিয়ে দিতে পারে। কিন্তু আমার অত সাধ্যি নেই। যখন আমি নিজের ভেতরের শক্তি দিয়ে ভূতকে প্রতিরোধ করি তখন ভূতের মনের জোরের চেয়ে আমার মনের জোর বেশী থাকে। তাই কোন ভূতই আমাকে কাবু করতে পারে না। যদি আমি একটু নরম হতাম তাহলে আমার মনের জোর কমে যেত আর ভূতটা তার সুযোগ নিত। সেই ভূতটা আমাকে অনেক কিছুই অনুরোধ করেছিল কিন্তু ভাগ্যি ভাল আমি ওর কোন ফাঁদেই পা দিইনি।

একথা শুনে যারা দাদুকে সমালোচনা করছিল তারা এবার তার সঙ্গে একমত হল।



একটি "নারকেল" বোমা

হান চিং-ইউয়ান



হাইনান দ্বীপের নারকেল বাগান গ্রামে কাও নামে একজন বৃদ্ধ লোক ছিলেন—তাকে সবাই ঠাকুর্দা বলে ডাকত। এই ঠাকুর্দা এই গ্রামেরই একজন প্রাক্তন লালরক্ষী ছিলেন। সময়টা ছিল ১৯৪০ সালের গ্রীষ্মের শেষের দিক। একদিন ঠাকুর্দা শুনলেন যে একদল জাপানী সৈন্য আমাদের গেরিলা ঘাঁটি আক্রমণ করতে গেছিল এবং তারা আমাদের গেরিলা বাহিনীর কাছে প্রচণ্ডভাবে মার খেয়ে পালিয়ে গেছে। এই পলাতক বাহিনী যাবার সময় এই গ্রামের ভেতর দিয়েই যাবে। সুতরাং ঠাকুর্দা এমন একটা ব্যবস্থা করবার চেষ্টা করছিলেন যাতে পালাবার সময় সেই বাহিনীকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া যায়।

ঠাকুর্দা কাও মনে মনে একটা পরিকল্পনা করে ফেললেন এবং সেই পরিকল্পনার কথা তার ছোট্ট নাতনী ইউইংকে ডেকে বললেন। তারপর তিনি ইউইংকে জিজ্ঞেস করলেন, "হ্যারে, তোর পরিকল্পনাটা কেমন লাগছে? তোর মাথায় যদি অন্য কোন চিন্তা থাকে তবে তাও বলতে পারিস।" ইউইং তো ঠাকুর্দার পরিকল্পনাটা শুনে আনন্দে লাফিয়ে উঠে বলল, "চমৎকার হবে ঠাকুর্দা! চমৎকার!"

বিষয়টা নিয়ে খানিকক্ষণ চিন্তা করে নিয়ে সে ঠাকুর্দার কানে কানে তার মতামতটা জানাল। ঠাকুর্দা মাথা নেড়ে বললেন, "ভালই হল—আমরা দুজনে একই রকম ভাবছিলাম। চল সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেলি।"

তারা দুজনে মিলে গন্ধক, পটাশ, লোহার টুকরো, কাচের টুকরো প্রভৃতি জিনিষ জোগাড় করে ফেলল। তারপর তারা নারকেল বাগানে গিয়ে হাজির হল। ইউইং তড়তড় করে একটা নারকেল গাছে উঠে গেল এবং তার কোমরে ঝোলানো ছুরি দিয়ে একটা নারকেল কেটে আনল।

সেই নারকেলটার মাথায় খুব যত্ন নিয়ে একটা ছোট্ট গর্ত করে ফেলল তারা। আর নারকেলের ভেতরের জল ও শাঁস বের করে ফেলল। নারকেলটাকে বেশ কিছুক্ষণ রোদে ফেলে রাখায় ভেতরের ভেজা অংশটা শুকিয়ে গেল। সেই গর্তের ভিতর তারা তাদের তৈরী বারুদ ও অন্যান্য জিনিষগুলো ঢুকিয়ে

দিল। তারপর বোমাটা ফাটাবার জন্য একটা ফিউজ লাগিয়ে দিল সেই গর্তটার মুখে। এবার সবার উপরে সেই গর্ত কেটে বার করা ছোট ডাবের টুকরোটা এমনভাবে বসিয়ে দিল যে দেখে বোঝাই যাবে না যে ওই জায়গাটা কাটা হয়েছিল।



সবে তারা তাদের "নারকেলটা" তৈরী করেছে, এমন সময় দেখা গেল যে সেই জাপানী সৈন্যবাহিনীর কমাণ্ডার ও তার দুজন সৈন্য উদ্‌ভ্রান্তের মতো সেই নারকেল বাগান গ্রামের দিকে হেঁটে আসছে। তারা মাত্র তিনজন কেন? আর সব গেল কোথায়?

ব্যাপারটা যা ঘটেছিল—সেইদিন সকালে এই জাপানী সৈন্যবাহিনীর কমাণ্ডার শ'খানেক সৈন্য নিয়ে আমাদের জাপ-বিরোধী ঘাঁটির কাছাকাছি একটা

জায়গায় আক্রমণ ক'রে আমাদের মজুত শস্য লুট করতে এসেছিল। কিন্তু আমাদের চিউনগিয়া বাহিনী ও স্থানীয় গণবাহিনী আগে থেকেই সেখানে মাটির তলায় মাইন পুতে রেখেছিল। সেই শত্রু সৈন্য পৌছন মাত্রই সে সব মাইন ফেটে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হয় এবং তারা টুকরো টুকরো হয়ে যায়। কেবল শত্রুর এক অফিসার ও এই সৈন্য দুজন বেঁচে যায়। তারা শত্রু ব্যূহ ভেদ করে কোনক্রমে পালিয়ে যায়। এই তিন শত্রুই আজ এই গ্রামের ভেতর দিয়ে পালাচ্ছে।

পথ চলতে চলতে ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে এই আক্রমণকারীরা নারকেল বাগান গ্রামে এসে উপস্থিত হয়। রাস্তার ধারে সারি সারি নারকেল গাছে অজস্র ঝুনো নারকেল দেখে তাদের খিদে দ্বিগুণ বেড়ে গেল। সেই কমাণ্ডার তার সৈন্য দুজনকে তার জন্য কিছু নারকেল কেটে আনবার আদেশ দেয়।

কিন্তু তার সৈন্য দুজন এতই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে যে তারা সেই গাছে উঠতেই পারল না। একজন সৈন্য কয়েক হাত উঠেই ধপাস করে পড়ে গেল। কমাণ্ডার তো রেগেই আগুন। সে খাপ থেকে তার তলোয়ারটা একটানে বার করে আনল। গাছটাকেই কেটে ফেলবে।

সে যেই গাছটা কাটতে যাবে, অমনি দেখা গেল গেল ছোট্ট ইউইং শান্তভাবে এগিয়ে আসছে। তার কাঁধে ঝোলানো রয়েছে একটা ঝুড়ি। আর সেই ঝুড়ির মধ্যে রয়েছে একটা নারকেল। তারা সেই ঝুনো নারকেলটা দেখেই ইউইং এর দিকে ছুটে গেল। এবং এক ঝটকায় সেই নারকেলটা তার কাছ থেকে কেড়ে নিল। ছোট্ট ইউইং এমন ভান করল যে মনে হল সে ভয় পেয়েছে। "ও মাগো" বলে ডেকে সে ছুটে পালিয়ে গেল।

তারপর সেই নারকেলটাকে একটা পাথরের উপর রেখে যেই কমাণ্ডার তার তলোয়ার দিয়ে একটা কোপ দিয়েছে। "বুম্‌"! "নারকেল" বোমা প্রচণ্ড শব্দে ফেটে গেল। কমাণ্ডার তৎক্ষণাৎ মারা গেল। আর অপর দুজন সৈন্য ভীষণভাবে আহত হল। গ্রামের সকলে এসে ওদের বন্দী করল।

খবরটা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। সেইদিন থেকেই সর্বত্র সেই দেশী বোমা ও বন্দুকের ব্যবহার চলতে লাগল। এক এক জায়গার লোকেরা এক এক রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করে। জাপানী দস্যুরা ক্রমেই নানারকম গণ্ডোগোলের মধ্যে পড়তে থাকে। আর জনগণ তাদের একের পর এক বিজয়ে আরও বেশী বেশী আনন্দিত ও অনুপ্রাণিত হতে লাগল।

ভূতের দাম দেড়হাজার



নান্ ইয়াংয়ের সাং তিং পো যুবক বয়সে এক রাতে পথ চলতে চলতে একটা ভূত দেখেছিল।

সাং জিজ্ঞেস করল—'কে তুমি ?'

—'ভূত।' ভূতটা জবাব দিল। তারপর ভূতটা প্রশ্ন করল—'কে তুমি ?' সাং মিথ্যে করে বলল—'আমিও একটা ভূত।'

—'কোথায় যাচ্ছ তুমি ?'

—'ওয়াং শহরে যাচ্ছি।'

—'আরে, আমিও তো ওখানেই যাচ্ছি।'

তারপর সেই ভূত আর সাং একসঙ্গে পথ হাঁটতে লাগল।

—'এইভাবে হাঁটা অসুবিধে। আচ্ছা, আমরা একজন আর একজনকে পালা করে বয়ে নিয়ে যেতে পারি ?' ভূতটা পরামর্শ দিল।

—'খুব ভাল বুদ্ধি।' সাং সঙ্গে সঙ্গে ওর কথায় সায় দিল।

এরপর প্রথমে ভূতটা সাংকে খানিকটা পথ বয়ে নিয়ে গেল।

—'উঃ, তুমি কি ভারী গো। ভূতটা বলল—'তুমি কি সত্যিই ভূত ?'

—'আমি হলাম নতুন ভূত।' সাং জবাব দিল— 'সেজন্যই আমি একটু ভারী।'

এরপর সাং ভূতটাকে খানিকটা বয়ে নিয়ে গেল। ভূতের ওজন প্রায় কিছুই ছিল না। এভাবেই ওরা পালা করে একে অন্যকে বয়ে নিয়ে চলল।

—'যেহেতু আমি একজন নতুন ভূত—' সাং যেতে যেতে ভূতটাকে প্রশ্ন করল— 'তাই আমি জানিনা ভূতেরা সবচেয়ে কোন জিনিষকে বেশী ভয় পায়।'

—'আমরা মানুষের থুতুকে সবচেয়ে বেশী ভয় বা ঘেন্না করি।' ভূতটা জবাব দিল।

ওরা চলতে চলতে একটা নদীর ধারে এসে পড়ল। সাং ভূতটাকে আগে নদী পেরোতে বলল এবং ভূতটা কোন শব্দ না করেই—তরতরিয়ে নদী পেরিয়ে গেল। কিন্তু সাং যখন পেরোল তখন বেশ শব্দ হল।

ভূতটা বলল—'তুমি এত শব্দ করলে কেন ?'

—'আমি তো নতুন ভূত তাই আমি এখনো জলের উপর দিয়ে চলতে অভ্যস্ত হইনি। এজন্যে তুমি আমাকে দোষ দিতে পারোনা।'

তারা যখন ওয়াং শহরের মুখে পৌঁছাল তখন সাং ভূতটাকে কাঁধের উপর তুলে নিল। ভূতটা তাকে নামিয়ে দেবার জন্যে খুব অনুনয় বিনয় করল কিন্তু সাং



তার কথায় কান না দিয়ে সোজা শহরে গেল। যখন সাং ভূতটাকে ঘাড় থেকে মাটিতে নামাল তখন সেটা একটা ভেড়ার রূপ ধারণ করেছে।

সাং তাড়াতাড়ি ভেড়া থেকে অন্য কোন রূপ ধারণ করার আগেই সেটাকে বাজারে বেচে দিল। এবং দেড় হাজার টাকা পকেটে পুরে ঘরে ফিরে গেল।

দেশের একজন মহান ধনী লোক শি চাঙ এই ঘটনা শুনে বলেছিলেন—

'সাং তিং পো বড্ড ভাল, কাজ করেছে মজার,
ভূত বেচে সে পেয়েছে নোট কড়কড়ে দেড় হাজার।'

★

কাকতাড়ুয়া

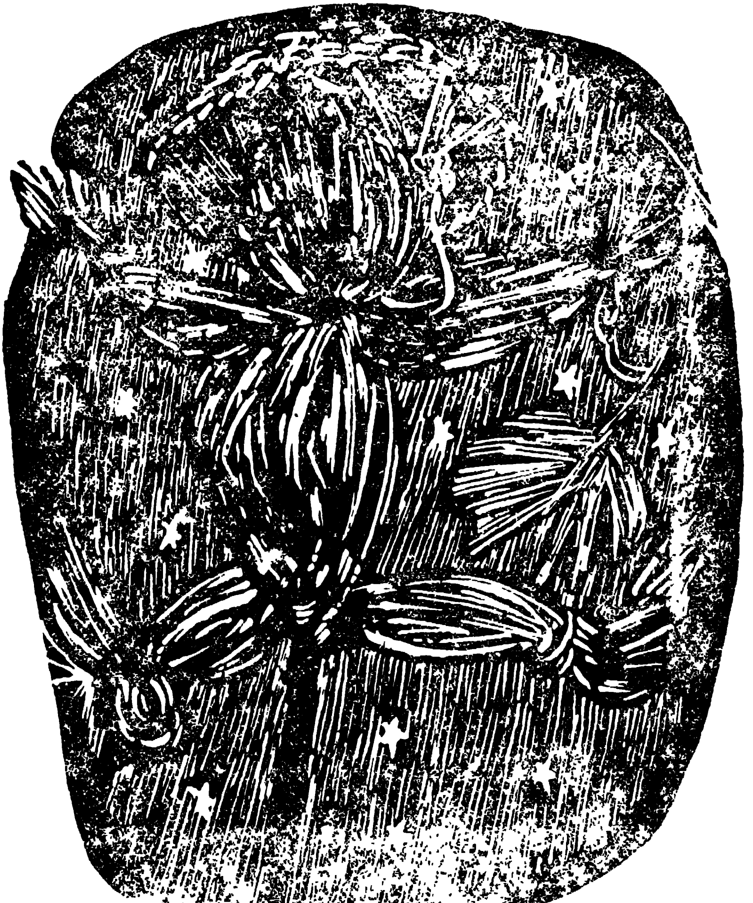
ইয়ে শেং-তাও

কবি ও শিল্পীরা তাঁদের কবিতা ও ছবিতে সুন্দরভাবে গ্রামীণ দৃশ্য বর্ণনা করেছেন। রাত্রে গানের সরঞ্জাম নিয়ে শিল্পীরা নীচু গলায় গান গায়, কবিরা কিছুটা বিভোর হয়ে থাকে। তখন মাঠে যাবার সময় থাকে না তাঁদের। রাত্রে মাঠ দেখতে কেমন, সেখানে কী হয়, কেউ কি বলতে পারে? হ্যাঁ কেবল কাকতাড়ুয়া পারে।

চাষীরা কাকতাড়ুয়া তৈরী করে। বাঁশঝাড় থেকে আনা সুন্দর বাঁশের কঞ্চি দিয়ে ওর কাঠামো তৈরী হয়। পুরনো হলদে খড় দিয়ে শরীরের পেশী ও চামড়া তৈরী হয়। একটা ভাঙা বাঁশের ঝুড়ি অথবা একটা পদ্মপাতা ওর টুপি হিসাবে কাজ করে। তার নীচে ওর মুখটা এতই সমান যে নাক ও চোখের পার্থক্য বোঝা মুস্কিল। ওর আঙুল-বিহীন হাত একটা ভাঙা পাখা ধরে থাকে—আসলে "ধরে থাকা" বলাটা ভুল, কেননা ওর আবরণ থেকে পাখাটা কেবল বাতাসে দোলে। ওর মেরুদণ্ড বিরাট বড়। নীচের অংশটা পা পর্যন্ত নেমে গেছে এবং চাষীরা ওটাকে মাটিতে ঢুকিয়ে রাখে। সারা দিনরাত সে ঐভাবে দাঁড়িয়ে থাকে।

কাকতাড়ুয়ার দায়িত্বজ্ঞান ভীষণ। মাটিতে প্রায়ই শুয়ে পড়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা গরুর মত সে অতটা কুঁড়ে নয়। অথবা পালিয়ে বেড়ানো কুকুরের মত পাজি নয় যে তার প্রভুকে তার জন্য সারা জায়গা খুঁজে বেড়াতে হবে। কাকতাড়ুয়াটা ঐ গরুর মত শুয়ে পড়ে আকাশ দেখে না। কুকুরের মত যেখানে সেখানে ছুটে বেড়ায় না। নীরবে সে ঐ মাঠ ঘাটের দিকে লক্ষ্য রাখে। নতুন গজিয়ে ওঠা ধানের শিষে ছোট্ট পাখীরা এসে ঠোকর মারে, হাত

পাখাটা অল্প নাড়িয়ে সে তাদের তাড়িয়ে দেয়। কাকতাড়ুয়া কখনো খায় না বা ঘুমোয় না। এমনকি বিশ্রামের জন্য সে বসে পড়ে না। সোজা হয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে।



সুতরাং কাকতাড়ুয়াই একমাত্র জানতে পারে, রাত্রে মাঠঘাট কেমন দেখতে লাগে, সেখানে কী হয়। কেমন করে মিষ্টি শিশির গাছের পাতায় ছড়িয়ে পড়ে, সে জানতে পারে। সে দেখতে পায় তারাগুলো মিটমিট করে জ্বলছে। চাঁদ হাসছে। রাত্রিবেলা গাছপালা, ফুলগুলো যখন গভীর ঘুমে মগ্ন, কাকতাড়ুয়া

সেই নীরবতা বুঝতে পারে। কেমন করে পোকামাকড়রা নিজেদের অন্য পোকামাকড়দের খুঁজে বেড়ায়। প্রজাপতিরা একে অপরকে ভালোবাসে, সে তা লক্ষ্য করে। সব মিলিয়ে রাতভর যা কিছু ঘটে যায় সবই সে জানতে পারে।

কাকতাড়ুয়ার চোখে রাতের কিছু ঘটনা এই রকম: একদিন রাতে আকাশ ভরা তারা। হাতের পাখাটা অল্প নাড়িয়ে সে সারা মাঠে নজর রেখে যাচ্ছে। নতুন ধানের শিষগুলো পরস্পর খসখস শব্দ করছে। তারার আলোগুলোকে জলের বুদবুদের মত আবছা দেখাচ্ছে। জোরে বাতাস বইতেই মনে হল ধানের বোঁটাগুলো ফিসফিস করে কথা বলছে। ঐ দৃশ্য দেখে কাকতাড়ুয়ার ভারী আনন্দ হল। সে নিশ্চিত ছিল, এবছরের ফসল তার গরীব বুড়ী দিদিমণির মুখে হাসি ফোটাবে। সে কখনো তার হাসি দেখেনি। আট নয় বছর আগে তার স্বামী মারা গেছে। সে কথা মনে পড়লেই সে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ত। চোখদুটো লাল হয়ে যেতো। তার একটি ছেলে ছিল। স্বামীর কবর দেবার খরচ মেটাতে মা-ছেলের পুরো তিন বছর কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছিল। কিন্তু শীঘ্রই তার ছেলে ডিপথেরিয়া রোগে মারা গেল। সে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। সেই থেকে তার হৃৎপিণ্ডে গণ্ডগোল দেখা দিল। দিনে দিনে সে দুর্বল এবং বুড়ী হয়ে যেতে লাগল। তাকে একাই জমি চাষ করতে হয়। ছেলের কবর খরচার জন্য ধার করে আনা টাকা সে তিনবছর পরই মিটিয়ে দিল। কিন্তু তারপর দুবছর পরপর বন্যায় মাঠের সব ফসল নষ্ট হয়ে গেল। ভীষণ কান্নাকাটিতে তার চোখের দৃষ্টি গেল খারাপ হয়ে। আর মোটেই সে পরিষ্কার দেখতে পায় না। শুকনো কমলালেবুর খোসার মত তার মুখ কুঁচকে গেল—কেমন করে সে হাসবে। কিন্তু সে বছর প্রচুর ধান ফললো। অতিরিক্ত বৃষ্টিও হয়নি। বেশ ভালো পরিমান ফসল জমবে—এই আশায় বুড়ীর জন্য কাকতাড়ুয়ার ভারী আনন্দ হল। চাষের সময়, মোটাসোটা ধান-শিষ দেখলে সে বুঝবে তার পরিশ্রম নষ্ট হয়নি। মুখের দাগগুলো মিলিয়ে গিয়ে সে তৃপ্তিতে হাসবে। যদি সত্যি সত্যি সে হাসতো তবে আকাশের তারা বা চাঁদের হাসির থেকেও কাকতাড়ুয়ার কাছে তা বেশী মূল্যবান মনে হতো। কারণ সে তার বুড়ী দিদিমণিকে ভালোবাসে। কাকতাড়ুয়া যখন মনে মনে ভীষণ চিন্তা করছে একটা ছোট হলদে-সাদা রঙের মথ পোকা হঠাৎ পাশ দিয়ে উড়ে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝতে পারল ওটা তার দিদিমণি এবং ধানের শত্রু। সে পাখাটা নাড়িয়ে দিল। কিন্তু বাতাস এত কম যে তাতে মথ

পোকাটা ভয়ে পালাল না। কাকতাড়ুয়াকে অনায়াসে এড়িয়ে সে এক জায়গা ছেড়ে অন্য একটি ধানের গায়ে গিয়ে বসল। এইসব দেখেশুনে সে ভীষণ আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। কিন্তু মাটিতে গাছের শিকড়ের মতো সে এক পাও এগোতে পারে না। সে যতই বাতাস করুক, ঐ খুদে মথ কিন্তু ধানের উপর বসে থাকে। নষ্ট ফসল, দিদিমণির ভাঙা গাল, চোখের জল আর কষ্টের কথা ভেবে কাকতাড়ুয়ার মনে হল তার হৃৎপিণ্ডে যেন ছুঁড় বিঁধে আছে। পাখা নাড়ানো সত্ত্বেও মথ পোকা তার জায়গাতেই বসে থাকে। রাত শেষে তারাগুলো না নিভলে ঐ ছোট্ট মথ পোকা উড়বে না। বিষণ্ণ মনে কাকতাড়ুয়া ধানের দিকে চোখ মেলে তাকায়। ঠিকই, ধানের বোঁটার মাঝখানটায় চিড় খেয়েছে। উপরের সবুজ পাতাগুলোর মাথা নুয়ে পড়েছে। কী করুণ দৃশ্য! পাতাগুলোর পিছনে মথ ডিম পেড়েছে। দেখেশুনে কাকতাড়ুয়া ভয় পেয়ে গেল। যত সে ভাবছে, তার কেবল মনে হচ্ছে সামনেই ভয়ঙ্কর সর্বনাশ। তার দুঃখী দিদিমণি এসব ভাল দেখতে পায় না। সময় থাকতে ফসলগুলো বাঁচাবার জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দিদিমণিকে তার সাহায্য করা উচিত। মরিয়া হয়ে সে পাখা নাড়তে থাকে। কখনো সেটা তার গায়ে লেগে জোরে শব্দ হয়। একমাত্র এইভাবেই সে দিদিমণিকে সজাগ করে দেওয়ার চেষ্টা করে, কারণ সে কথা বলতে পারে না।

বৃদ্ধা মহিলাটি মাঠে আসে। সামনের দিকে ঝুঁকে সে নিশ্চিত হয় মাঠে অনেক জল, কাজেই নদী থেকে আর জল তোলবার দরকার নেই। ধানের দিকে একবার তাকিয়ে তার মনে হয় বেশ তাজাই আছে। বোঁটাগুলো ছুঁয়ে দেখে বেশ ভারী এবং মোটা। তারপর সে একবার কাকতাড়ুয়ার দিকে তাকায়। টুপিটা ঠিকভাবে লাগানো আছে, পাখাটা এখনো সামনে পিছনে সজোরে দুলছে। একই জায়গায় স্বাভাবিক দৃষ্টিতে সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সবকিছু ঠিকঠাক আছে দেখে খড়ের দড়ি পাকাতে পাকাতে সে ঢালু পথে বাড়ীর দিকে পা বাড়ায়।

তাকে চলে যেতে দেখে কাকতাড়ুয়া ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। তাকে ফিরিয়ে আনার আশায় সে সজোরে তার পাখা ঝাপটায়। সে বোঝাতে চাইল: দিদিমণি যেয়ো না। মাঠেতে সব ঠিক আছে, এমনটা ভেবো না। সর্বনাশের বীজ বোনা হয়েছে। যখন তা বাড়বে তুমি অসহায় হয়ে পড়বে। চোখের জল শুকিয়ে আসবে,তোমার হৃদয় ভেঙে পড়বে। খুব দেরী হওয়ার আগেই পোকামাকড়-

গুলোকে ধ্বংস করতে তোমার অবশ্যই কিছু করা উচিত। এই বোঁটাগুলো দেখ, পাতার পিছনটা তাকিয়ে দেখ। বারবার সে পাখার শব্দে সতর্কতা জানাল। কিন্তু বৃদ্ধা মহিলাটি বুঝতে পারল না, ধীরে ধীরে চলে গেল। দিদিমণি চোখের বাইরে চলে না যাওয়া পর্যন্ত দুশ্চিন্তায় কাকতাড়ুয়া পাখা দিয়ে সজোরে শব্দ করতে লাগলো। সে বুঝতে পারল, তার সতর্কতা ব্যর্থ হল।

কাকতাড়ুয়া ছাড়া আর কেউ সেই ফসলের জন্য চিন্তিত নয়। যদি সে লাফিয়ে পড়ে মথ পোকার ডিমগুলো নষ্ট করতে পারতো! এই সর্বনাশ আটকাতে যদি সে দিদিমণিকে ফিরিয়ে আনতে পারতো! বাতাসকে বলে যদি সে বার্তা পাঠাতে পারতো! ভারাক্রান্ত, দুর্বল হয়ে সে নিজেকে সোজা রাখতে পারছিল না। কাঁধ দুটো সামনের দিকে নুয়ে পড়েছে, পিছনটা বেঁকে গেছে। তাকে অসুস্থ লোকের মত দেখতে লাগছিল।

কিছুদিনের মধ্যে সারামাঠ জুড়ে হলদে শূককীট ছড়িয়ে পড়ল। গভীর রাতে চারপাশ নিস্তব্ধ। কাকতাড়ুয়া শুনতে পেল ধানের বোঁটা থেকে পোকাগুলো রস শুষে খাচ্ছে। দেখা গেল, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ওরা উড়ে যাচ্ছে। ধানের শিষগুলো ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে ঝুলে পড়েছে এবং পাতাগুলো হলুদবর্ণ এলোমেলো হয়ে গেছে। ঐ দৃশ্য সহ্য করা ওর পক্ষে কঠিন। চোখের জল এবং দুঃখ ছাড়া দিদিমণির কঠিন পরিশ্রম যে তাকে কিছুই দেবে না—এই চিন্তাই কাকতাড়ুয়ার মাথা হেঁট করে দিল। সে কেঁদে ফেলল।

বছরের এই সময়টাতে বিশেষতঃ রাত্রিবেলা খোলা মাঠে, আবহাওয়াটা ঠাণ্ডা হতে থাকে। কাকতাড়ুয়া বাতাসে কাঁপতে থাকে। ভীষণ কান্নায় সে তা বুঝতেই পারে না। হঠাৎ সে একজন মহিলার গলার শব্দ পেল: "আমি অবাক হয়ে ভাবছিলাম কে হতে পারে, এখন দেখছি তুমিই—" সে চমকে উঠল। তখনই সে ঠাণ্ডাটা বুঝতে পারল। কিন্তু কী-ই বা করার আছে? কর্তব্যের খাতিরে সে স্বাধীনভাবে নড়তে চড়তে পারে না; ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। ঐ গলার আওয়াজ একজন জেলেনীর। নদীর ধারেই ওর নৌকো বাঁধা। মাঠের দিকেই যাচ্ছিল, ভিতর থেকে আবছা আলো আসছিল। মহিলাটি নদীতে তার জাল পেতে পাড়ে বসে অপেক্ষা করছিল।

একটি শিশুর কাশির শব্দ আসছিল। তারপর ভিতর থেকে খুব দুর্বল কণ্ঠে 'মা-মা' ডাক শোনা যাচ্ছিল। মহিলাটি এতে অস্বস্তি বোধ করছিল। সমস্ত

শক্তি দিয়ে যদিও মহিলাটি জালটা টেনে তুলছিল কিন্তু কী যেন একটা গোলমাল হচ্ছে, কারণ প্রায় সময়ই তার জাল ফাঁকা ওঠে। সে অসুস্থ শিশুটিকে ডেকে বলল : "ঘুমাও এখন! একটা মাছ পেলে কাল আমি তোমার খাবার তৈরী করতে পারবো। সবসময় আমায় ডেকে বিরক্ত করো না। কী করে আমি মাছ ধরবো তাহলে?"

শিশুটি নিজেকে ঠিক না রাখতে পেরে কেঁদে বলল : "মা, আমার খুব তেষ্টা পেয়েছে, একটুখানি চা দাও।" আবার একবার কাশির শব্দ হল।

"আমি এখন তোমার জন্য চা পাবো কোথায়? কিছুক্ষণ চুপ করে থাকতে পারো না?" "এত পিপাসা পাচ্ছে!" শিশুটি ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। রাত্রে খোলা মাঠে ছেলেটির দীর্ঘনিঃশ্বাস হৃদয় বিদীর্ণ করে দেয়।

অনিচ্ছুকভাবে জেলেনী জালটা নামিয়ে রেখে নৌকায় ফিরে যায়। সে ঘরের ভিতরে ঢুকে বাটি করে নদী থেকে সামান্য জল তুলে অসুস্থ শিশুটিকে দেয়। ভীষণ পিপাসায় ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে তা খেয়ে নেয়। কিন্তু বাটিটা যেই রাখতে গেল ওর প্রচণ্ড কাশি পেল। কিছুক্ষণ বাদে সে হাঁপিয়ে উঠল।

জেলেনী বেশীক্ষণ শিশুটির কাছে থাকতে পারল না। জালটা দেখবার জন্য তাকে নদীর পারে যেতে হল। ছাউনির ভেতরটা যখন নীরব হয়ে এল, তারও বেশ কিছুক্ষণ বাদে অনেক ব্যর্থ চেষ্টার পর জেলেনী সাত-আট ইঞ্চি লম্বা একটা রূপোলী মাছ ধরলো। এটাই তার প্রথম মাছ ধরা। আবার জাল পাতার আগে খুব যত্ন করে সে জাল থেকে মাছটা ছাড়িয়ে একটি কাঠের বালতিতে রাখল। কাকতাড়ুয়ার পায়ের ঠিক কাছাকাছি বালতিটা রইল।

কাকতাড়ুয়ার অবস্থা খুব দুঃখজনক। তৃষ্ণার্ত শিশুর জন্য তার করুণা হচ্ছিল। সে চা খেতে পায়নি। অসুস্থ অবস্থায় মাকেও কাছে পায়নি। জেলেনীর জন্য কাকতাড়ুয়ার দুঃখ হচ্ছিল। কারণ পরের দিন এক বাটি ফেন-এর জন্য ঐ শীতের রাত্রে অসুস্থ শিশুটিকে সে ফেলে গেছে। শিশুটির চা তৈরীর জন্য কাকতাড়ুয়া যদি জ্বালানির কাজ করতে পারতো! সে যদি পারতো শিশুটিকে একটি লেপের উষ্ণতা দিতে! যদি ধানের ক্ষেত থেকে পোকাগুলোকে তাড়িয়ে দেবার সামর্থ তার থাকতো তবে জেলেনীর খাবার তৈরীর জন্য সে কিছু চাল জোগার করতে পারতো। হাঁটতে পারলে সে তাড়াতাড়ি ইচ্ছামত কাজ করতো। কিন্তু দুর্ভাগ্য, মাটিতে গাছের শিকড়ের মতো তার অবস্থা, একপাও নড়তে পারে না। তার কিছুই করার নেই।

যতই সে এইসব চিন্তা করে, মন তার ততই খারাপ হয়। সে আরও কাঁদতে থাকে। হঠাৎ একটা শব্দ শুনে সে ভয় পেয়ে যায়। কান্না বন্ধ হলে সে দেখতে পায় রূপোলী মাছটা কাঠের বালতিতে লাফাচ্ছে।

খুব অল্প জল ছিল বালতিতে। শুধুমাত্র মাছটার নীচটা ভিজেছে। হতভাগা মাছটা উঠে আসবার জন্য খুব চেষ্টা করছে। সমস্ত শক্তি দিয়ে লাফাচ্ছে। অনেকবার চেষ্টা করছে কিন্তু সর্বদাই বালতির নীচে পড়ে থেঁতলে গিয়ে ব্যথা পাচ্ছে। যখনই কাকতাড়ুয়ার দিকে চোখ পড়ল, সে প্রার্থনা জানাল: "কিছুক্ষণের জন্য তুমি পাখাটা রাখ বন্ধু, আমাকে বাঁচাও। জল ছেড়ে দূরে গিয়ে আমি মরে যাব। বন্ধু, দয়া করে আমাকে বাঁচাও।"

মাছটির আন্তরিক আবেদনে কাকতাড়ুয়ার ভীষণ দয়া হল। কিন্তু মাথাটা নাড়িয়ে সে যেন কেবলমাত্র এইটুকু বলতে পারে: "আমাকে ক্ষমা করো, আমি দুর্বল এবং অসহায়। তোমাকে, এমনকি তোমাকে যে ধরেছে সেই জেলেনী, তার ছেলে এবং সবাইকে উদ্ধার করতে আমি চাই, আর কিছু নয়। কিন্তু গাছের মত আমি মাটিতে আটকে আছি, একপাও নড়তে পারছি না। তাই আমাকে ক্ষমা কর। আমি বড় দুর্বল এবং অসহায়।"

মাছটি কাকতাড়ুয়ার কথা বুঝতে পারল না। ওর মাথাটা নড়ছে দেখে সে আগুনের মত জ্বলে উঠল। চীৎকার করে বললো: "এটা খুব কঠিন কাজ নয়। তুমি কী নিষ্ঠুর, শুধু মাথা নাড়ছো। আমাকে সাহায্য করার জন্য বোকার মত আমি অন্যকে বলছি। আমার নিজেরই নিজেকে সাহায্য করা উচিত। যদি না পারি, মরবো। আর কী?" এই কথা বলে আবার সমস্ত শক্তি দিয়ে সে লাফাতে থাকে। ওর লেজ এবং পাখাগুলো শক্ত হয়ে ওঠে।

কাকতাড়ুয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। রূপোলী মাছ ওকে ভুল বুঝেছে। ওর পক্ষে এর চেয়ে আরও ভালভাবে বোঝানো সম্ভব ছিল না। কিছুক্ষণ বাদে কাকতাড়ুয়া মাথা তুলে চারপাশটা দেখে নিল। একহাতে জালটাকে ধরে জেলেনী ঘুমিয়ে পড়েছে। সে এতই ক্লান্ত যে ঘুম ভাঙানো কঠিন অথচ পরের দিনের খাবারের চিন্তা তার আছেই। বালতির ভিতর মাছটার কী হবে? লাফঝাপ কমেছে কিন্তু লেজটা মাঝে মাঝেই দাপাদাপি করছে। গত রাত্রের সব দুঃখজনক ঘটনাগুলো কাকতাড়ুয়া মনে মনে ভাবছে। কী বেদনাময় রাত্রিই না ছিল। হলুদ পোকাগুলো কিন্তু খুব খুশী। খাওয়া দাওয়া সেরে পাতার উপরে উঠে তারা আনন্দে নাচছে। ফসলগুলো সব নষ্ট হয়ে

গেল। তার দিদিমণির সমস্ত পরিশ্রম ব্যর্থ হয়ে গেল। এর চেয়ে দুঃখজনক ঘটনা পৃথিবীতে আর কী হতে পারে ?

রাত আরও ঘন হয়ে এল। তারাগুলো ঝাপসা হয়ে এসেছে। কাকতাড়ুয়া হঠাৎ দেখতে পেল একটা কালো শরীর গোপনে আলপথ বরাবর যাচ্ছে। কাছে এলে সে ভাল করে দেখল, একটা ছোট ঢোলা জামা পরা একজন মহিলা। তার চুলগুলো এলোমেলো। কিছুক্ষণের জন্য সে থামল। নদীর ধারে মাছের নৌকোটার দিকে তাকাল। তারপর ঘুরে গিয়ে নদীর দিকেই হাঁটতে শুরু করল। কিছুদূর গিয়ে আবার থেমে পড়ল। কাকতাড়ুয়া ভীষণ কৌতূহলে তাকে লক্ষ্য করতে লাগল। মহিলাটি আপন মনে মাঝেমাঝে করুণ স্বরে নীচু গলায় বিড়বিড় করছে। রাতের ছোটখাট শব্দের সাথে পরিচিত একমাত্র কাকতাড়ুয়া তা শুনতে পাচ্ছে। মহিলাটি বলছে : "আমি গরু বা শুয়োর নই যে তুমি ইচ্ছেমত আমায় বিক্রী করতে পারো। কাল বিক্রী করবার আগেই আমি পালিয়ে যাবো। যা কিছু সামান্য টাকা পাও তুমি জুয়ো খেলে বা মদ খেয়ে নষ্ট করো। ব্যাস, এই তুমি পারো। তুমি কেন আমায় তাড়িয়েছ ?......আমার কাছে মৃত্যুই এখন একমাত্র পথ। মরবার পর অন্য পৃথিবীতে আমার ছেলের খোঁজ করব।" কী ভয়ঙ্কর কথা সে বলছে ! অনুতাপে তার গলার আওয়াজ বন্ধ হয়ে আসছিল।

এই নতুন দুঃখের ঘটনায় কাকতাড়ুয়া শিউরে উঠল। মহিলাটি তার নিজের জীবন দিতে যাচ্ছে। তাকে বাঁচাবার তাগিদে কাকতাড়ুয়া অস্থির হয়ে উঠল। ঘুমন্ত জেলেনীকে জাগিয়ে দেবার আশায় আবার সে পাখা নাড়তে লাগল। কিন্তু নিষ্ফল চেষ্টা। মরা মানুষের মতো সে ঘুমোচ্ছে, কোন সাড়া দিল না। গাছের মত মাটিতে আটকে থেকে এক পাও নড়তে না পারার জন্য কাকতাড়ুয়া নিজেকে ধিক্কার জানালো। কাউকে মৃত্যুর হাত থেকে না বাঁচানোর অর্থ সত্যিই পাপ। এই চিন্তা তাকে তার নিজের মৃত্যুর চেয়েও বেশী আঘাত দিল। "তাড়াতাড়ি সকাল হোক, চাষীরা জাগুক, পাখীরা আকাশে উড়ে খবর ছড়িয়ে দিক, বাতাস ওর মৃত্যুর ইচ্ছাকে উড়িয়ে নিক।" নীরবে সে মনে মনে প্রার্থনা জানাল। তখন চারপাশ অন্ধকার, কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছে না। ভাঙা হৃদয় নিয়ে সে তাকাতেও ভয় পাচ্ছিল। নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা আবছা মানুষটার জন্য সে চোখের জল সামলাতে পারলো না।

কিছুক্ষণের জন্য মহিলাটি দাঁড়িয়ে রইল। মাঝে মাঝে সে সামনে পিছনে

ডুলছিল। সেই মারাত্মক বিপজ্জনক মুহূর্তটির জন্য কাকতাড়ুয়া ভয় পেয়ে গেল। আরও জোরে সে পাখাটা দোলাতে লাগল। লাফ দেবার বদলে মহিলাটি সোজা হয়ে দাঁড়াল। কিছু সময় পেরিয়ে গেল। তারপর হঠাৎ সে হাতদুটো তুলে নদীর জলে ঝাঁপ দিল। জলে পড়ার শব্দ শোনার আগেই কাকতাড়ুয়া জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

পরের দিন সকালবেলা চাষীরা নদীর পাড়ে এসে মহিলাটির মৃতদেহ দেখতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে খবর ছড়িয়ে পড়ল। পাড়াপ্রতিবেশী মেয়েপুরুষরা সেই দৃশ্য দেখবার জন্য ছুটে এল। হৈচৈতে জেলেনীর ঘুম ভাঙল। মাছটার দিকে তাকিয়ে দেখল, ইতিমধ্যে মরে শক্ত হয়ে গেছে। কাঠের বালতিটা তুলে নিয়ে সে নৌকোর ছাউনিতে চলে গেল। অসুস্থ শিশুটি জেগে আছে, মুখটা আরও রোগা, ঘন ঘন কাঁদছে। অন্যদের পিছন পিছন বৃদ্ধা কৃষক মহিলাটিও নদীর ধারে এসেছে। গত কয়েকদিনের মধ্যে সমস্ত ধানের বোঁটাগুলো পোকায় কেটে রেখেছে, কেউ তাকে জানায়নি। কাঁচা ধানের শিষগুলো নীচু হয়ে ঝরে পড়ছে। সবুজ পাতাগুলো সব হলদে হয়ে গেছে। হতাশায় দুঃখে সে নিজের পা পিষতে লাগল। বুক চাপড়ে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল। তাড়াতাড়ি সবাই তাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে দেখল, বিধ্বস্ত মাঠের উপর কাকতাড়ুয়া মুখ থুবড়ে সটান পড়ে আছে।



ব্যাং ভূতের কাণ্ড



চ্যাং চৌ নামক স্থানের একজন পণ্ডিত-লোক নিজের সাহসের জন্যে খুব গর্ববোধ করত এবং বলত—পৃথিবীতে ভয় করার মতন কিছুই নেই। কিছু কিছু লোক ভয় পায়—কিন্তু সেই পণ্ডিত লোকটি সব সময় দুঃখ করে বলত—'এমন কোন ভূত বা আত্মা নেই যে তার সাহসকে ভেঙ্গে দিতে পারে।'

একদিন সেই লোকটি তার বন্ধুদের সঙ্গে এক গ্রামে গিয়েছিল। সেখানে সে একটা সিল্কের র‍্যাপারের মধ্যে কিছু নড়তে চড়তে দেখল। তার বন্ধুরা তো ভয়ে র‍্যাপারটার দিকে তাকাতেই সাহস করল না।

বন্ধুদের ভয় দেখে লোকটা হেসে বলল—'আমার বড়ই অভাব, আমি এই র‍্যাপারটা নিয়ে যাই না কেন?'

বলে সে সকলের সামনে র‍্যাপারটা মেলে ধরল। কয়েক ভাঁজ খোলার পরই তার মধ্য থেকে তিনটে রূপোর বাট আর ব্যাঙের মতন দেখতে একটা অদ্ভুত প্রাণী বেরুল। সে রসিকতা করে সেই অদ্ভুত প্রাণীটিকে বলল—'দূরহ শয়তান, আমি তোকে চাইনে। আমি চাই কেবল রূপো আর এই সিল্কের র‍্যাপারখানা।'

যখন সে ঐ জিনিষগুলো নিয়ে বাড়ী ফিরে এল তখন তার বাড়ীর লোকেরা শুনে খুব কান্নাকাটি জুড়ে দিয়ে বলল—'এখন কোন্‌দিন যে কি বিপদ ঘটবে কে জানে!'

—'যদি বিপদ ঘটে তাহলে আমিই তার সবটুকু মাথা পেতে নেব। তোমাদের এর মধ্যে জড়াতে হবে না।' লোকটি বাড়ীর লোকদের ভরসা দিল।

সেই দিনই রাতে বিছানায় শুতে গিয়ে সে দেখল তার মাদুরের উপর এক বছরের বাচ্চার সাইজের দুটো সবুজ কোলা ব্যাং। সে সময়ে সে সবে

ভাবছিল মদের সঙ্গে কিছু একটা খাওয়া দরকার। সুতরাং ব্যাং দেখেই সে একটা মুগুর দিয়ে ব্যাং দুটোকে মেরে ফেলল। তার পরিবারের লোকেরা তাই দেখে আবার জুড়ে দিল কান্নাকাটি। কিন্তু সে আনন্দের সঙ্গে ব্যাং দুটোকে কেটে রান্না করে খেয়ে বিছানায় শুতে গেল এবং বেশ শান্তিতেই রাত কাটাল।

পরের রাতে সে দেখল আকারে আগের চেয়ে ছোট এক ডজন ব্যাং তার বিছানায়। এবং সেগুলোকেও সে আগের মত রান্না করে খেল। তারপরের রাতে দেখল তিরিশটা ব্যাং তার ঘরে। এইভাবে রাতের পর রাত ব্যাংয়ের সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়ে চলল এবং ব্যাংয়ের আকার আরো ছোট হয়ে এল। এক সময় তার ঘর ব্যাংয়ে ভরে গেল। আর অত ব্যাং তার একার পক্ষে খাওয়া সম্ভব হল না। তাই সে দ্বিগুণ উৎসাহে একজন জনমজুরকে ঐ ব্যাংগুলো মেরে কবর দেবার জন্যে ভাড়া করল। প্রায় একমাস এই ঘটনা ঘটে চলল। তারপর একসময় ব্যাংয়ের আবির্ভাব বন্ধ হয়ে গেল। সেই পণ্ডিতলোকটা হেসে বলল—'ও, তাহলে ঐ অদ্ভুত প্রাণীটার এইটুকুই মাত্র এলেম?'

যদি আবার ব্যাংয়ের আবির্ভাব হয় সেজন্যে ব্যাং ধরে খেয়ে ফেলবার জন্যে তার স্ত্রী তাকে কয়েকটা সঁজারু কিনতে বলল। কিন্তু সে বলল—'আমি সঁজারুর চেয়ে কম কিসে? এর চেয়ে সঁজারুরা আর বেশী কি করত?'

এরপর থেকে তার পরিবার আর কোন বিপদের সম্মুখীন হয়নি। এবং তার পরিচিত লোকেরা তার সাহস দেখে তাকে বেশ সমীহ করে চলতে লাগল।



বোনটির নাম হাসিখুশি



১৯৪৪ সালে, বসন্তকালের শেষদিকে ঘটনাটি ঘটল। সন্ধ্যাবেলায় একদিন চিন-তাকাঙ্, শত্রুপক্ষের শক্ত ঘাঁটি তল্লাশি করে ফিরছিল। তাইহু হ্রদের তীর বরাবর সে হাঁটছিল। লম্বা ঘাসের আড়াল থেকে লাঠি হাতে একটি লোক লাফিয়ে পড়ল। ঘন ভ্রু, জ্বলজ্বলে চোখ নিয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল, "থামো, কী আছে তোমার কাছে?" শশার মত ঠাণ্ডা তাকাঙ্ টুপিটা খুলে হেসে বলল: "কী ব্যাপার? মাত্র তিনদিন বাদে তুমি তোমার বন্ধুকে চিনতেই পারছো না?" কালো ষাঁড় চ্যাঙ্ নামে পরিচিত, চ্যাঙ-হি-নিউ, ভালো করে তাকালো: "আরে! এ যে দেখছি তুমি, আমি ভেবেছিলাম শত্রুর গুপ্তচর।" তারপর সে সঙ্কেত জানাল। নলখাগড়ার বন পেড়িয়ে এক ছোট নৌকা বেরিয়ে এল। ওতে বিপ্লবী বাহিনীর চারজন সৈন্য ছিল। তারা হাত নেড়ে বলল: "এই যে তা-কাঙ্, বোন হাসিখুশি তোমাকে যে কাজ দিয়েছিল, তা তুমি নিশ্চয়ই শেষ করেছো?" নৌকোর মধ্যে লাফিয়ে উঠে সে বলল: "ড্রাগন সেতুর দিকে তিনবার তাকিয়ে আমি শত্রু ঘাঁটির সন্ধান পেলাম।" ওরা সবাই বলে উঠল: "বোন হাসিখুশি ইতিমধ্যেই গেরিলা ঘাঁটিতে চলে গেছে। মনে হচ্ছে আমরা খুব শীঘ্রই জাপানী দুর্গ আক্রমণ করতে চলেছি।" ঐ অঞ্চল পরিবেষ্টিত জাপানী আক্রমণকারীরা বেরুনোমাত্র তাই-হু গেরিলা ও বিপ্লবী বাহিনীর হাতে বেশ মার খেল। সেতুর কাছে শক্ত ঘাঁটি তৈরীর জন্য ওরা সুচাউ থেকে সৈন্য পাঠিয়েছিল। সেতুটির সামনের দিকে তাই-হু হ্রদ। পিছন দিকে শহর। ওটা ছিল যাতায়াতের গুরুত্বপূর্ণ সংযোগস্থল।

গোটা জায়গাটা নিয়ন্ত্রণে রাখার আশায় শত্রুপক্ষ ওখানে ঘাঁটি তৈরী করেছে।

ড্রাগন সেতুর জাপানী অফিসারটি দেখতে বেঁটে খাটো, মোটা। মাথায় অল্প টাক, ভালুকের মত বড় পেট। এইজন্য স্থানীয় লোকেরা ওর ডাক নাম রেখেছে "পিপে"। পিপে ছিল লম্পট। হত্যা, লুণ্ঠন, আগুন লাগানো ওর কাছে অন্যায় নয়। অনেকদিন আগেই তাইহু গেরিলা এবং বিপ্লবী বাহিনী প্রতিজ্ঞা করেছিল ওর মুণ্ডচ্ছেদ করে ঘাঁটি নিশ্চিহ্ন করার।

বিপ্লবীরা যখন উত্তেজিত হয়ে কথা বলছিল, তাকাও হঠাৎ তখন চেঁচিয়ে উঠল: "আরে দেখ, কে আসছে! সবাই তাকিয়ে দেখল, বিপ্লবী বাহিনীর বোন হাসিখুশি আসছে। নৌকোয় উঠে সে বলল: "কমরেডস, আমাদের নেতৃবৃন্দ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, ১০ তারিখ বিকেলে তাইহু গেরিলা বাহিনী চিঙ্সি শহরের ঘাঁটি উড়িয়ে দেবে। 'পিপের' দলবলকে নিশ্চিহ্ন করে শত্রুপক্ষের জোট ঠেকাতে নেতৃবৃন্দ বিপ্লবী বাহিনীকে গেরিলাদলের সাথে যোগাযোগ করে কাজ করতে বলেছে।"

কালো ষাঁড় বুক বাজিয়ে বলে উঠল: "হ্যাঁ, ওখানে যেতে আমার ইচ্ছে করছে। আদেশ পাওয়া মাত্র আমার জীবনের বিনিময়েও আমি জাপানীদের হত্যা করতে যাব।" হাসিখুশি বোনটি বলল: "ষাঁড়ের মত তুমি যেতে চাইছ। ওটা ঠিক নয়। আচ্ছা, তা-কাঙ-এর কাছ থেকে শত্রুঘাঁটি সম্পর্কে খবর শোনা যাক।" "ড্রাগন সেতুতে ১৫ জন জাপানী এবং একজন চীনা বিশ্বাসঘাতক রয়েছে। সে দোভাষীর কাজ করছে।" তা-কাঙ বলল: "ওদের কাছে দশটি রাইফেল এবং দুটো মেশিনগান আছে।"

কালো ষাঁড় মাঝখানে বলে উঠল, "যখন আমরা আক্রমণ শুরু করব, প্রত্যেকে আমাকে অনুসরণ করবে এবং সেতুর কাছে এসে প্রতিরোধ করবে। যদি 'পিপে'কে আমি জীবন্ত ধরতে না পারি তবে আমার নাম কালো ষাঁড় নয়।" হাসিখুশি ওর মাথাটা নাড়িয়ে দিয়ে বলল: "কিন্তু আমরা বেপরোয়াভাবে এ কাজ করতে পারি না, কেননা শত্রুঘাঁটি সেতুর উপর নজর রাখছে এবং অন্যান্য ঘাঁটিগুলি এত কাছে যে একটি বন্দুকের শব্দ সঙ্গে সঙ্গে শত্রুসেনাকে জড়ো করে দেবে। যদি আমরা ঠিক পথে না এগোই তবে গোটা পরিকল্পনাটা বানচাল হয়ে যাবে।" প্রত্যেকেই মন দিয়ে তার কথা শুনছিল। সে বলতে লাগল: "নেতৃত্ব বারবার আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে

বেপরোয়া আক্রমণ সর্বনাশা। আমাদের মাথা খাটিয়ে শত্রুকে ছত্রভঙ্গ করে বিচ্ছিন্ন করতে হবে।" সকলে তাকে সম্মতি জানাল। কালো ষাঁড় অস্বস্তির সাথে পুষ্ট গলাটা ঘসে নিয়ে বলল: "ঠিক আছে, অতটা উৎসাহ ভালো নয়। শত্রুকে ছোট করে দেখা ঠিক নয়।" তারপর তা-কাঙ পিপের হালফিল অপরাধের কথা জানিয়ে বলল: "গত পরশুদিন সে বেয়নেটের ভয় দেখিয়ে একটি যুবতী মেয়েকে অপমান করতে চেয়েছিল। মেয়েটি বাধা দেয়।" এই কথায় সহযোদ্ধা বন্ধুরা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। আপন ভাই ও বোনেদের হয়ে প্রতিশোধ নেবার জন্য তারা শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল। কালো ষাঁড় বলল, "ঠিক আছে বোন, তাড়াতাড়ি তোমার পরিকল্পনা শোনা যাক।" "সবাই মিলে আলোচনা করা যাক", উত্তরে হাসিখুশি বলল। কিন্তু অন্য সবাই বলল: "আগে তোমার পরিকল্পনাটা শুনি, তারপর আমরা ভেবে বলবো।" মাথা নেড়ে একমত হয়ে সে বলল: "আমরা একটা 'বিবাহ উৎসব' এর ব্যবস্থা করবো। তোমরা কী বল?" সকলেই ঘাবড়ে গেল। কালো ষাঁড় আরো বেশী মুষড়ে গিয়ে দাবী জানাল: "আচ্ছা, তোমার যদি কোন বড় ভাবনা থেকে থাকে, বলে ফেলো।" হাসিখুশি হেসে ফেলল, তারপর তাড়াতাড়ি ছকটা ব্যাখ্যা করতে লাগল। মাঝখান থেকে কালো ষাঁড় বলে উঠল, "বিরাট ব্যাপার, আমি ভয় পাচ্ছি 'পিপে' আবার বাদ না পড়ে যায়।" তা-কাঙ তার পিঠে আঘাত দিয়ে বলল: "তুমি এখনো তেমনি অস্থির? ওকে শেষ করতে দাও।" ওর কথা শেষ হলে সবাই খুশি হয়ে উঠল। তারপর তারা মনখুলে ছক সম্পর্কে নিজস্ব মতামত জানাল। সবশেষে হাসিখুশি প্রত্যেককে কাজ ভাগ করে দিল। শুধু কালো ষাঁড় বাদ। এককোণে বসে উৎকণ্ঠা নিয়ে সে মাথা ঘসছিল। হাসিখুশি হেসে বলল: "তোমাকে কনের সাজে পুতুলের মত চেয়ারে বসিয়ে রাখব। কিন্তু মেজাজ তোমার ঠিক রাখতে হবে। সময় না হলে তুমি কোনো সংঘর্ষে যাবে না।" কালো ষাঁড় সম্মতি জানাল। "তুমি এখন ফিরে গিয়ে প্রস্তুত হতে পারো"—হাসিখুশি বলল: "আমি নেতৃত্বের কাছে খবরটা দিতে যাচ্ছি।" সকলে তাকে বিদায় জানাল।

পরের দিন বিকেল চারটে নাগাদ উত্তর-পূর্ব কোণ থেকে বাতাস বইতে শুরু করল। আকাশ থমথমে এবং মেঘে ঢাকা। "পিপে" এবং তার সাঙ্গপাঙ্গরা দোভাষীকে নিয়ে ওদের ঘাঁটিতে জড় হল। ওরা তাস নিয়ে মেতে আছে। হঠাৎ বাইরে থেকে বিস্ফোরণের শব্দ এল। জাপানীরা হতচকিত হয়ে গেল।

নীরবে কান পেতে ওরা নানারকম শব্দ শুনতে পেল। পিপে তার পাশে দাঁড়ানো লম্বা মোটাসোটা সৈনিকটিকে ফিসফিস করে কয়েকটি কথা বলল। সৈনিকটি সেলাম জানিয়ে বেরিয়ে গেল। ক্রমশ শব্দটা আরো জোরে কাছাকাছি আসতে লাগল। অসুস্থ 'পিপে' দোভাষীকে বাইরে গিয়ে ব্যাপারটা দেখে আসতে বললো। বিশ্বাসঘাতকটি বাইরে এসে দেখল, একটা চকচকে কারুকাজ করা পালকি বয়ে আনছে আটজন লোক। ওরা ধীরে ধীরে সেতুর দিকে এগুচ্ছে।

শোভাযাত্রার নেতৃত্বে আছে একজন ত্রিশ বছর বয়সী মহিলা। মাথায় ফুলছাপ কাপড়, পরনে লাল জ্যাকেট এবং সবুজ এ্যাপ্রন। তার হাতে একটি মেহগনি কাঠের বাক্স। প্রধান তত্ত্বাবধায়িকার ছদ্মবেশে হাসিখুশি শোভাযাত্রায় আসছিল। লাল এবং সবুজ পোষাক পড়া চারজন যুবতী মেয়ে কাছাকাছি তাকে অনুসরণ করছিল। ওদের হাতে বেশ বড় লাল লণ্ঠন। তার গায়ে সোনালী অক্ষরে লেখা ছিল "হাসিখুশি"। হৈ হট্টগোলের সাথে বেশ কিছু লোক শিঙ্গা বাজিয়ে যাচ্ছিল। পালকির সামনে এবং পিছনে কেউ বাজী পোড়াচ্ছে। কেউ বা উপহার বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। দেখে ব্যাপারটা সত্যিকারের উৎসব বলে মনে হচ্ছিল। এককোণে দাঁড়িয়ে থাকা মোটাসোটা জাপানী অফিসারটি ঘাবড়ে গেল। দোভাষী লোকটা ঘাঁটির দিকে ফিরে গেল। সে চীৎকার করে বলল: "স্যার, একটা বিয়ের শোভাযাত্রা যাচ্ছে। 'হাসিখুশি' এর নেতৃত্বে আছে।"

আতঙ্কিত "পিপে" তাড়াতাড়ি তলোয়ার বার করে জিজ্ঞেস করল: "কী ব্যাপার এখানে সেই বিপ্লবী বাহিনীর মহিলা, হাসিখুশী?" ভয়ে ঠাণ্ডা হওয়ার পক্ষে শত্রুর কাছে ঐ নামটাই যথেষ্ট। দোভাষীটি মাথা নাড়িয়ে অনিচ্ছুক হাসি হেসে বলল: "না না, ভুল বুঝবেন না। আসলে গাঁয়ের লোকেরা একটা পালকি বয়ে আনছে। লাল লণ্ঠনগুলোর গায়ে সোনালী অক্ষরে লেখা 'হাসিখুশি'।" দোভাষীর ব্যাখ্যা সত্বেও "পিপে" স্বস্তি পেল না। সে বলল: "যাও, আর একবার ভাল করে দেখ।" মনে মনে দোভাষী ভাবল: "কী বোকামী, পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি বিয়ের শোভাযাত্রা, অত সন্দেহের কী আছে?" কিন্তু একথা বলবার সাহস তার নেই, সুতরাং বাইরে তাকে যেতেই হলো। সেই পালকিটা এখন সেতুর কাছ বরাবর। মোটাসোটা জাপানী অফিসার তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে কুৎসিত ভঙ্গিতে বলল, "থামো! কী করছো তোমরা?"

সেতুর পথ আটকে শোভাযাত্রা থেমে গেল।

নদীর পশ্চিম দিক থেকে একটা নৌকো এসে ভিড়ল, তীর বরাবর এসে চিন-তাকাঙ্ মাঝির ছদ্মবেশে বসে ছিল। সেতুর কাছে এসেই সে চীৎকার করে বলল: "তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি পথ ছাড়ো।" সেতুর কাছে লোকগুলো মেজাজ নিয়ে চীৎকার করে বলল: "তুমি কে হে, চেঁচাচ্ছ কেন? দেখতে পাচ্ছ না পথ বন্ধ!" একথা শুনে মাঝি উঁচু গলায় গালমন্দ করতে লাগল।

প্রধান তত্ত্বাবধায়িকা দেখল দোভাষী লোকটা ঘাঁটি থেকে বেরিয়ে আসছে! সে ধীরপায়ে মাঝির কাছে গিয়ে ব্যাপারটা বোঝাতে লাগল। তা দেখে বেশ কিছু লোক বল্লম, বাঁশের লাঠি হাতে নিয়ে নৌকো থেকে লাফিয়ে পড়ল, মারামারি করবার জন্য তারা পাড়ে উঠে এল। নৌকো থেকে শিঙ্গা-বাজিয়ে লোকগুলো আদৌ ভীতু নয়। ওরা রাস্তার সামনে এসে মারমুখী ভঙ্গিতে দাঁড়াল। পালকি বাহকেরা পালকিটিকে সেতুর মাঝামাঝি নিয়ে গেল। জাপানী সেনারা থামাতে চেষ্টা করল কিন্তু পারল না। সাথে সাথে দর্শকদের ভীড় হতে লাগল। ওরা সেতুপথ আটকে দিল। দোভাষী লোকটা তাড়াতাড়ি সেতুর কাছে থামতেই মাঝি তাকে ধীরে বলল: "মশায়, বলুন তো কে সঠিক?" "দল নায়িকা" হেসে ব্যঙ্গ করে বলল: "ওর মত জানতে চাইছো? ভুল করছো। এখন সবকিছুই বেসামাল। কে কাকে বিশ্বাস করবে?" রেগে গিয়ে মাঝি বলল: "আপনি মীমাংসা চাইছেন না, কেন মিছিমিছি সময় নষ্ট করে অসুবিধায় ফেলছেন? কেন মেটাতে পারছেন না?"

"দলনায়িকা" দোভাষী লোকটার দিকে দৃষ্টি রেখে "মাঝি"কে বলল: "আপনি আপনার পথে যান, আমি আমার পথে। কেউ কারো ধার ধারবো না।" দোভাষী লোকটা ওদের কথায় কান পেতেছিল। প্রত্যেকটা কথা ওকে ঠিক আঘাত করছিল। সে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল: "আরে বাজে কথা নয়। কোত্থেকে তোমরা আসছো?" কেউই তার কথা শুনলো না। ওরা কথা বলতেই ব্যস্ত। দোভাষী লোকটা কিছুই করতে পারল না।

কিছুক্ষণ বাদে, আরও চারজন জাপানী সৈনিক ব্যাপারটা দেখতে দৌড়ে এল। ওদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য দোভাষী 'দলনায়িকাকে' ধমকে বলল: "তাড়াতাড়ি বল, তোমরা কোত্থেকে আসছ। রাজ সেনাবাহিনী তদন্ত করতে আসছে।" ওর দিকে একরকম না তাকিয়েই দলনায়িকা উত্তর দিল: "আমরা

কুয়াঙ্‌ফু শহর থেকে আসছি।" দোভাষী জিজ্ঞেস করল: "কনে কে?" পাশেই একটি মেয়ের হাত থেকে একটা বড় লণ্ঠন সে তুলে ধরল। তাতে লেখা "চিয়া"। "মেয়েটি অবশ্যই চিয়া পরিবারের"—সে বলল। দোভাষী লোকটা বুঝতে পারল। চিয়া হল কুয়াঙ্‌ফু শহরের একনম্বর পরিবার। সে বলল: "সুন্দরী তাহলে বিয়ে করতে যাচ্ছে। ভাগ্যবান বরটি কে?" উত্তরে সে বলল: "খুবই মানানসই। ছেলেটি চিয়েন পরিবারের যুবক। এর চেয়ে আর ভাল কী হতে পারে?"



দোভাষী জানতো কুমারী চিয়া দেখতে খুব সুন্দরী, কিন্তু সে কখনো তাকে দেখেনি। মনে মনে ভাবল: হাজার কথার চাইতে একবার দেখাটাই বড় এবং এইটেই উপযুক্ত সময়। এই ভেবে সে পর্দাটা তুলবার জন্য এগিয়ে গেল। কিন্তু "দলনায়িকা" তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে তাকে থামিয়ে দিল। দোভাষীটি দেঁতো হাসি হেসে বলল: "একবার দেখা যাক না, এতে আর আপত্তির কী আছে?" "দুঃখিত, আপনি তা পারেন না। মেয়েটি খুব লাজুক এবং নম্র। ওর কিছু ক্ষতি হলে আমি দায়ী হতে পারি না।"

সেই সময় পালকি বাহক ও শিঙা বাজিয়েরা "বড় মাঝির" সাথে তর্ক শেষ করে কী ঘটছে দেখতে এল। সবাই একযোগে চীৎকার করে বলল: "দেখুন,

আপনারা এসব বন্ধ করুন। আমাদের যেতে দিন। সন্ধ্যে হয়ে আসছে।" দোভাষীর মনটা ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেল, বলল: "রাজ সেনাবাহিনীর নির্দেশ মত আমি কাজ করছি। তাকে অগ্রাহ্য করবে কে? প্রত্যেককে পরীক্ষা করে দেখতে হবে।" 'দলনায়িকা' বুদ্ধি খাটিয়ে মার্জিত ভঙ্গীতে বলল: "খুব শীঘ্রই আপনারা আমাদেরকে অন্যায়ভাবে জড়িয়ে ফেলবেন।" দোভাষী তাড়াতাড়ি ভেবে নিল: মাষ্টার চিয়া একজন সুপরিচিত দলত্যাগী মানুষ। জিজ্ঞাসাবাদের পক্ষে আদৌ ভাল লোক নয়। কিন্তু রাজ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে কোন কাজ সে করেনি। সুতরাং সে আমতা আমতা করে বলল: "কিন্তু কে জানে পালকির ভিতর কে আছে?" উত্তরে হাসিখুশি বলল: "তুমি জোর করবার কে? বিয়ে করবার সময়ে কেউ গণ্ডগোল পাকায়?" তারপর পালকির দিকে তাকিয়ে সে চীৎকার করে বলল: "ওহে মেয়ে, তুমি উদ্বিগ্ন হয়ো না। কিছুক্ষণের মধ্যেই সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।" এই বলে সে তাকে একঝলক দেখাবার জন্য পালকির পর্দাটা তাড়াতাড়ি তুলে ধরল। তার চোখের সামনে দৃশ্যটা ঝলসে যেতেই দোভাষী বুঝল কনে সত্যি সত্যিই ভিতরে বসে আছে। তার মাথায় রঙীন ওড়না এবং পরনে ফুল-ছাপ কাপড়। মোটা জাপানী সেনাটির চিবুকটি নাড়িয়ে বিড়বিড় করে দু'কথা বলে সে ঘাঁটির দিকে চলে গেল।

দোভাষীকে ফিরে আসতে দেখেই "পিপে" জিজ্ঞেস করল: "কি হচ্ছে?" হতাশ হয়ে দু হাত তুলে সে উত্তর দিল: "মহামান্য, সত্যি সত্যিই এটা বিয়ের মিছিল, আর কিছু না।" "পিপে"র তাতেও সন্দেহ হল। দোভাষী আরও এগিয়ে এসে ফিসফিসে গলায় বলল: "মহামান্য, কোনও ভুল নেই। কনেটি ঐ এলাকার সবচেয়ে সুন্দরী। আমি নিজে চোখে তাকে দেখলাম।" এই কথা শোনার পর তার সব সন্দেহ দূর হল। তারপর তার মাথায় এক দুষ্টুবুদ্ধি খেলে গেল। সে বলল: "আচ্ছা, ঠিক আছে আমি একবার দেখব।" কিন্তু তখনও তার ভয় হাচ্ছল। সেনাদের বলল: "তোমরা প্রত্যেকে আমাকে অনুসরণ করো।" সবাই দরজার দিকে ছুটে গেল।

ইতিমধ্যে আকাশে চাঁদ উঠেছে। সেতুর উপর শত্রুর মোকাবিলা করতে গিয়ে "দলনায়িকা" দেখতে পেল ঘাঁটি থেকে 'পিপে' বেরিয়ে আসছে। সে আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠল। "পিপে" কাছে আসতেই দেখতে পেল, চারিদিকে সমস্ত গ্রামবাসীরা জড়ো হয়েছে কনেকে বিদায় জানাতে। তার সমস্ত সন্দেহ তখন উবে গেল। সে তাড়াতাড়ি পর্দা তুলবার জন্য পালকির কাছে গেল।

"দলনায়িকা" পথ আটকে দাঁড়াল। চোখ দুটো তার চারপাশ ঘুরে এল। প্রত্যেকে নিঃশ্বাস বন্ধ করে তাকে লক্ষ্য করছিল। দেখা গেল সে হাত তুলে মাথার ফুল-ছাপ কাপড়টা মেলে ধরেছে। "পিপে"কে পালকির দিকে আসতে দেওয়া হল। তারপরেই "দলনায়িকা" চীৎকার করে বলল: "বন্ধুরা, এইবার শুরু কর।" মুহূর্তেই জায়গাটা অশান্ত হয়ে উঠল। মেহগনি কাঠের বাক্সটা সে দোভাষীর মাথায় ছুঁড়ে মারল। ওর মাথা থেকে বেশ রক্ত পড়তে লাগল এবং সে মাটিতে পড়ে গেল। মোটাসোটা জাপানী সৈনিকটি ভয়ে শক্ত হয়ে গেছে। "বড়মাঝি" দড়িটা দিয়ে ওর ঘাড়টাকে ঘিরে ফাঁস লাগিয়ে দিল। শক্ত করে এঁটে ধরতেই জাপানী সৈনিকটি নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে মারা গেল। হাসিখুশি বোনটির পরিকল্পনা ছিল সংক্ষিপ্ত এবং দ্রুত। একটা বন্দুক বার করে শত্রু ঘাঁটিতে পাহারাদারদের দিকে লক্ষ্য করে সে গুলি করল। পাহারাদারটি মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। "বড়মাঝি" যখন একটা গ্রেনেড দিয়ে ওদের উড়িয়ে দেবে ভাবছিল, তখনই বেশ কিছু শত্রুসেনা পাল্টা গুলি ছোড়ার জন্য প্রস্তুত হল। পালকি-বাহক, মাঝি-মাল্লা এবং অন্য সবাই মিলে মাছ ধরার বর্শা, লাঠি ইত্যাদি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। হৈ হৈ শব্দে বেরিয়ে শত্রুদের তারা আক্রমণ করতে লাগল। শত্রুসেনারা দেখল ওদের বোকা বানানো হয়েছে। ঘাঁটিতে ফিরে ওরা বন্দুক উদ্ধার করার কথা ভাবল। কিন্তু দেখা গেল, সেতুপথ এবং ঘাঁটিতে ফেরবার রাস্তা সব আটকে দেওয়া হয়েছে।

ততক্ষণে যারা দাঁড়িয়ে দেখছিল তারাও লড়াইতে নেমে পড়ল। পালকির দিকে এগিয়ে "পিপে" কেবল কনের মাথার কাপড়টা খুলেছে—হা ঈশ্বর! এ কী ধরণের সুন্দরী। "সুন্দরী" কালো চামড়ার লোমশ পুরুষ হিসাবে দেখা দিল। চেঁচিয়ে সে বলে উঠল: "বদমাশ, এতদিন ধরে কালো ষাঁড় তোর জন্য অপেক্ষা করছিল।" জাপানী অফিসারটিকে সে চাপড় মারতে শুরু করল। "পিপে" ঘুষি, চড় খেয়ে গোঙাতে লাগল। তার নেশার ঘোর কেটে গেল। তাড়াতাড়ি একাধারে গড়িয়ে পড়ে তার পিস্তলটা বার করল। কালো ষাঁড় একটা লাথি মারতেই "পিপে"র পিস্তল উড়ে গেল। তাড়াতাড়ি তাকে তুলে ধরল কালো ষাঁড় এবং সেতুর উপর ছুঁড়ে ফেলে দিল। "পিপে"র মাথা ঘুরতে লাগল। চোখ অন্ধকার হয়ে গেল। বাঁচবার জন্য সে আপ্রাণ লড়তে লাগল। পালিয়ে যাবার চেষ্টা করল। কিন্তু কালো ষাঁড় একটা ছোরা বার করে ওর বুকে বসিয়ে দিল। "পিপে" যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠে নদীর জলে পড়ে

গেল। "তুই কোথায় যাচ্ছিস?" কালো ষাঁড় চেঁচিয়ে উঠল। হাত দুটো ছড়িয়ে ওর দিকে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কালো ষাঁড় ভালো সাঁতার জানত। সে এগিয়ে গিয়ে "পিপে"কে ধরে ফেলল। ছোরাটা উঁচিয়ে কয়েক ঘা বসিয়ে দিল। নদীর জল রক্তে লাল হয়ে গেল।

খুব তাড়াতাড়ি একটা পরিষ্কার যুদ্ধ শেষ হল। আধঘণ্টার মধ্যে ড্রাগন সেতুর সমস্ত শত্রু নিঃশেষ হয়ে গেল। তা-কাঙ এবং অন্যান্য কমরেডস মিলে সব অপহৃত বন্দুক, রাইফেল ইত্যাদি নৌকোর উপর জড়ো করল। কালো ষাঁড় পুরোপুরি ভিজে গেছে। কিন্তু সে খুব খুশি। উদ্ধার করা একটা পিস্তল উঁচিয়ে ধরে সে বলল: "একজন জাপানীকে শেষ করলাম, একটা বন্দুকও পেলাম। সত্যিই এটা দ্বিগুণ আনন্দের ব্যাপার।" দূর থেকে বেশ গোলাগুলির শব্দ আসছিল। হাসিখুশি বোনটির উৎসাহ বেড়ে গেল। "আমাদের গেরিলা বাহিনী শহরে শত্রুর ঘাঁটি আক্রমণ করছে।" সে বলল, "জনযুদ্ধে চেয়ারম্যান মাও-সে-তুঙ-এর ক্ষমতা অসাধারণ। বিপ্লবের জন্যে আমাদের লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। তাকাঙ, তুমি এখন একটি দল নিয়ে জঙ্গলের পাশে অপেক্ষা করো। অন্যসব কমরেডস নৌকোয় উঠে আমাকে অনুসরণ করো।"

বিরাট পৃথিবী চাঁদের আলোয় ভরে গেছে। মৃদুমন্দ রাতের বাতাস বইছে। ড্রাগন সেতুতে শত্রুর শক্ত ঘাঁটি নিশ্চিহ্ন করে হাসিখুশি বোনটি এবং তার সহযোদ্ধারা ভীষণ উদ্দীপিত হয়ে নতুন যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে চলল।





বনের সংগীত

ঝ্যাং জি

জনৈক বনরক্ষীর পুত্র সান চ্যাংনিং যাত্রা করার আগে তার ছেলেবেলা-কার সাথী সকল পাখীদের মুক্ত করে দিল। পাখীরা কিচির মিচির, কিচির মিচির করতে লাগল। মনে হল তারা যেন বলতে চেষ্টা করছে যে তাকে ছেড়ে যেতে তাদের ইচ্ছে নেই। কিন্তু সানের হৃদয়ের বাসনা ততক্ষণে দুরন্ত ল্যাজঝোলা পাখীর মতো মেঘের দিকে ডানা মেলেছে। হঠাৎই যেন সেই হৃদয়-বাসনার পাখীটা পেছন ফিরল; তারপর নীচে নেমে এসে বার্চ গাছ-গুলোর উপরে বহুক্ষণ ঘুরে ঘুরে অবশেষে একটি কবরের উপর বসল।

সেই বার্চ গাছের নীচে কে শান্তিতে বিশ্রাম করছেন? কার স্মৃতিতে ছেলেটির মন ভারাক্রান্ত? তিনি আত্মীয় নন, আবার তার বাল্যবন্ধুও নন।

ছ'বছর আগের ঘটনা। কোন এক গ্রীষ্মের ছুটিতে সান স্কুল থেকে ছাড়া-পেল। জেলেরা বনে গিয়ে বনরক্ষীদলকে মাছ জোগান দেয়। তাদের সংগে সান তার বাবার জঙ্গলে গেল। অনেকদিন হল বাবার সাথে তার দেখা হয় নি। সে গভীর বন খুব ভালবাসে। বনে বাস করলে প্রতিটি বালকই খুব খুশী হয়।

বনে গ্রীষ্মের রাত্রি খুব ছোট এবং সকাল হয় খুব তাড়াতাড়ি। সূর্য ওঠার আগে বন, পাহাড় ও ছোট ছোট সমতল ভূমিগুলো গভীর কুয়াশায় ঢাকা থাকে। সেই কুয়াশাকে ভেদ করে কেবল উঁচু উঁচু গাছের মাথাগুলো বেরিয়ে থাকে। সূর্য যখন আকাশের আরও উঁচুতে ওঠে তখন সেই কুয়াশা অদৃশ্য হয়ে যায়। ঘুমন্ত বন এবং ছোট ছোট সমতলভূমিতে ফিতের মতো জলস্রোতগুলোকে দেখা যায়। সেগুলোকে ঘিরে থাকে নানা রকম সবুজ রংয়ের মেলা। কোনটা সবুজ ঘন, কোনটা বা হালকা, কিন্তু যতদূর দেখা যায় শুধু সবুজ আর সবুজ।

বনটাকে সান চ্যাংনিং এর কাছে স্বর্গ বলে মনে হয়। এই বনের বেরী ফল খেয়ে তার ঠোঁট দুটো লাল টকটকে হয়ে ওঠে। পকেটে ভর্তি থাকে ফল। বনের সংগীতে তার হৃদয় নেচে ওঠে। তার পায়ের নীচে ঝরা পাতারা মর্মর ধ্বনি তোলে; গাছের পাতায় বাতাসেরা দীর্ঘশ্বাস ফেলে; এখানে সেখানে প্রজাপতি রং বেরং-এর ডানা মেলে উড়ে বেড়ায়, নানা রকম কীটপতঙ্গ বিভিন্ন রকমের শব্দ করে, মৌমাছিরা গুনগুন করে গান গেয়ে বেড়ায়; আর কাঠ ঠোকরা পাখী গাছের ডাল ঠুকরেই চলে।

একটা পাখীর ডাক শুনে গভীর বন থেকে আর একটা পাখী ক্ষীণ উত্তর পাঠায়। পাখীরা এমনভাবে ডাকে যেন মনে হয় তারা কথাবার্তা বলছে। আর অন্য অনেক পাখী তাদের গোপন স্থান থেকে সেই সমবেত সংগীতে যোগ দেয়। দূরে বনরক্ষীদের কথাবার্তা শোনা যায়। বনের সকল স্থান সংগীতে ভরে থাকে।

সেদিন সকালে, একটা বড় বাক্স নিয়ে সান রান্নার জন্য ব্যাঙের ছাতা সংগ্রহ করতে বেরোয়। সেবারের গ্রীষ্মকালে প্রচুর বৃষ্টি হওয়ায়, চারিদিকে অসংখ্য ব্যাঙের ছাতা গজিয়েছে। যখনই সে মনে করে যে যথেষ্ট ছাতা সংগ্রহ করা হয়ে গেছে আর নেব না, তখনই সে সামনের দিকে তাকিয়ে দেখতে পায় গাছের নীচে আরও অনেক বড় ছাতা রয়েছে। সেগুলোকে দেখে মনে হয় যেন মাথায় সাদা টুপী পরা সব নাদুস নুদুস বাচ্চা। তাদের মাথাগুলো যেন দুষ্টুমি করে বাঁকানো। সেগুলোর আকর্ষণে সান বনের ভিতরে আরো গভীরে চলে যায়।

হঠাৎ সে একটা অদ্ভুত শব্দ শুনতে পায়। সেই শব্দ অন্য সব পাখীর ডাকের থেকে অথবা পাতার উপরে বৃষ্টির শব্দ থেকে আলাদা; সেই শব্দ দূরের বনরক্ষীদের কথাবার্তার ক্ষীণ রেশ থেকে বা বাতাসের ফিসফিসানি থেকেও সম্পূর্ণ ভিন্ন। অথচ ছোটবেলা থেকে যত শব্দ তার চেনা সেই শব্দ যেন তাদের সকলের মতো। দূর থেকে ভেসে আসা অর্থহীন এই শব্দ যেন স্বপ্নের মতো মধুর। সান সেই শব্দে বিভোর হয়ে গেল।

সেই শব্দকে অনুসরণ করে সান একটি পরিষ্কার জায়গায় গিয়ে উপস্থিত হল। সেখানে বনরক্ষীরা কেটে ফেলা গাছের মধ্যে বসে বিশ্রাম করছে। তার বাবার সাথে একই তাবুতে বাস করেন লিয়াং মাস্টারমশাই। তিনি মন মাতানো সুরে একটি লম্বা চকচকে বাঁশী বাজাচ্ছেন আর তাকে ঘিরে বসে

আছে কয়েকজন মুগ্ধ শ্রোতা। বাতাসের দীর্ঘশ্বাসকে ছাপিয়ে সেই সুর বাজছে। সানের মনে হচ্ছে সে যেন একটি নতুন জগতে চলে এসেছে। এর আগে পর্যন্ত সানের জানা ছিল না যে এখানে বনের সৌন্দর্য ছাড়াও এমন সুন্দর জিনিস আছে।

কি বাঁশী এটা? এটা কি রূপকথার জাদু বাঁশী?

সান অনেক দিন আগেই তার বাবাকে লিয়াং মাস্টারমশাইয়ের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেছিল। "চারচক্র" তাকে শাস্তি দিয়ে বেজিং থেকে এই সুদূর বনে পাঠিয়ে দিয়েছে। তাছাড়া তিনি আবার ক্যান্সারে ভুগছেন।

সান তার বাবাকে প্রশ্ন করেছিল, লিয়াং মাস্টারমশাইয়ের অপরাধ কি। তার বাবা কোন উত্তর দেন নি। অবশেষে যখন সে প্রশ্ন করেছিল লিয়াং খারাপ লোক কিনা, তার বাবা অত্যন্ত রেগে উত্তর দিয়েছিলেন, "বাজে কথা বলিস না!" ঘাবড়ে গিয়ে সান প্রশ্ন করা বন্ধ করেছিল। সান জানে তার বাবা ভাল লোক। তিনি যখন লিয়াং এর সাথে বন্ধুত্ব করেছেন তিনি কখনই খারাপ লোক হতে পারেন না। এ ব্যাপারে সান খুবই নিশ্চিত।

"তিনি বেজিং এ ফিরে গিয়ে ডাক্তার দেখান না কেন?"

"তিনি যেতে রাজী নন।"

সান চুপ করে যায়। কেউ কি ডাক্তার না দেখিয়ে মরতে চায়? "কেন?" সান প্রশ্ন করে।

"কারণ তা করতে গেলে প্রথমে তাকে অপরাধ স্বীকার করে অন্যদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে হবে। তিনি তা চান না!"

সান আর কিছু বলল না। এই বালকটিও মনে করে যে আত্মসমর্পণ করা ও বিশ্বাসঘাতকতা করা লজ্জাজনক।

এভাবেই সান লিয়াং মাস্টারমশাইকে শ্রদ্ধা করতে আরম্ভ করেছিল। তিনি এমনই ব্যক্তি যিনি আত্মসমর্পণ করার চেয়ে মৃত্যুকে শ্রেয় মনে করেন।

হাততালি ও হর্ষধ্বনিতে সানের চিন্তা বাধা পেল। বনরক্ষীরা সব উঠে যে যার কাজে চলে গেল। সান যেখানে দাঁড়িয়ে নীরবে লিয়াং-এর দিকে তাকিয়েছিল, সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। সে তার মনের ভাব প্রকাশ করতে পারল না। তার অনুভূতি হল অদ্ভুত, অতল গভীর। সে যেন একটা জিনিস হারিয়ে আর একটা জিনিস পেল।

এই বাঁশীর সুর তার শৈশবের অজ্ঞতাকে হঠাৎ যেন দূর করে দিল। যে

বনের শব্দরাজি সে এতদিন শুনেছে তা ছিল অর্থহীন, অস্পষ্ট এবং রূপহীন। আর এখন সে পেয়েছে একটা স্পষ্ট রূপ। উৎসাহী ও সমঝদার শ্রোতাদের মধ্যে একমাত্র সানকে দেখেই মনে হচ্ছে যে সে যেন এই সুর শোনার জন্য বহু-কাল ধরে অপেক্ষা করেছিল।

তার এই মনের ভাব বুঝতে পেরে লিয়াং তাকে প্রশ্ন করলেন, "তোমার ভাল লেগেছে?"

সান মাথা নাড়ল শুধু। কথা বলার কোন প্রয়োজন নেই।

এবার লিয়াং কেবল তার একার জন্যই বাঁশী বাজালেন। সান আবার অভিভূত হয়ে পড়ল কিন্তু কোন কথা বলল না। যন্ত্রণায় যেন তার ভুরু কুঁচকে গেল। তারপর সে হঠাৎ লিয়াং একটু আগেই যে সুর বাজিয়েছেন তার একটা অংশ শিস দিয়ে বাজিয়ে দিল। তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কথার চেয়েও ভাল ভাবে সরগমগুলো তার মনের ভাবকে ফুটিয়ে তুলল।

সান তার সুরের অংশকে সঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারায় লিয়াং খুবই আনন্দিত হলেন। তিনি সানকে পরীক্ষা করার জন্য আর একটা সুর বাজালেন। সান সেটাও নিখুঁতভাবে বাজিয়ে দিল। ছেলেটির সঠিক স্মৃতি-শক্তি এবং সূক্ষ্ম সুরে বাঁধা কান দেখে লিয়াং খুব উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে সানের সংগীত-প্রতিভা আছে কিন্তু তা এখনও বিকশিত হয়নি।

সংগীতের উত্তেজনা ও আনন্দের মধ্য দিয়ে তাদের মধ্যে উষ্ণ বন্ধুত্ব গড়ে উঠল। তাদের বয়সের পার্থক্য উধাও হয়ে গেল এবং কোনখান দিয়ে যে সময় কেটে যেতে লাগল কেউ টের পেল না।

সান আর স্কুলে ফিরে যেতে চাইল না। লিয়াং এর সাথে বনে সে এমন অনেক কিছু শিখতে পারে যা তার স্কুলে শেখান হয় না। তাছাড়া লিয়াং তাকে পড়াশুনা শেখানোর সাথে সাথে বাঁশী বাজানোও শেখাতে লাগলেন। আগের মতোই লিয়াং বনরক্ষীদের খাবার সময় সুন্দর সুন্দর সুরে বাঁশী বাজান। বনরক্ষীরা লোকসংগীতের সুর ভালবাসেন বলে তিনি সেই সব সুরই বাজান। এই সুর পরিচিত ও মিষ্টি।

এই লোকটি ও বালকটির মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। তার বাবা ও অন্যান্য বনরক্ষীদের মতো সানও এই অসুস্থ লোকটির সেবাযত্ন করে। তাকে

বিশ্রাম নিতে বাধ্য করে। লিয়াং ভাল ছেলের মতো সেই বালকটির কথা শোনেন, তার সাথে ঠাট্টা করেন যাতে করে তার জন্য ছেলেটির কোন দুশ্চিন্তা না হয় এবং তিনি তার শরীরের আসল অবস্থা গোপন করে যান। তিনি সানকে বলেন, "আমি খুব ভাল বোধ করছি। অল্পবিস্তর কাজ করলে শরীর শক্ত হয় এবং অসুখও কমে আসে।" তিনি কাজ করতে ভালবাসেন বলে কাজ করেন, বাধ্য হয়ে নয়।

লিয়াং দেখেন যে প্রকৃতি ও কাজের প্রতি ভালবাসার জন্যই ছেলেটির চিন্তাশক্তি খুব ভাল। বিনা প্রচেষ্টাতেই বহু সহজ সরল সুর তার ঠোঁটে খেলে যায়। সেইসব সুরকে সত্যিকারের সংগীতে পরিণত করার জন্য লিয়াং সানের সাথে অনেক পরিশ্রম করেন। তিনি ছেলেটিকে খুব ভালবাসেন এবং তার প্রতিভা দেখে খুব আশ্বস্ত হন। তিনি জানেন যে তিনি আর বেশী দিন বাঁচবেন না। তাই তিনি সানকে নিয়েই বেশী সময় থাকেন। তাঁর ইচ্ছা, এই ছেলেটিকেই তিনি তার সমস্ত শিল্প সম্পদ উজাড় করে দেবেন। যাতে করে একদিন বনের এই বালকটি একজন খ্যাতনামা সংগীতশিল্পী হয়ে উঠতে পারে। তিনি নিশ্চিত যে সান একদিন বড় হয়ে উঠবে।

তিনি কখনও সানকে ঢিলে দিতে দেন না। একই সুর বার বার বাজাতে বলেন। মাঝে মাঝে সানের ইচ্ছা করে অবাধ্য বাঁশীটাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। বাঁশীটা যেন তার কথা শুনতে চায় না। একটা দুটো সুর হারিয়ে ফেলে বা তাতে ভুল করে। লিয়াং বলেন, "তোমার প্রতিভা আছে এক কথা ঠিক। কিন্তু প্রতিভা হচ্ছে মাটির গভীরে থাকা দামী পাথরের মতো। মাটি থেকে তুলে এনে ঘসে মেজে নিলে তবেই তা চকচক করে।"

সান আবার তার বাঁশীটা তুলে নেয়। সে এই বাঁশীকে যেমন ভালবাসে তেমনি ঘৃণা করে। এই বাঁশী যে আনন্দ ও দুঃখ দেয় সেটা আর কে বুঝতে পারে?

লিয়াং সানকে শুধু বাজনার কৌশলের ওপরে জোর দিতে দেন না। তিনি বলেন, "সেটা খুবই হাল্কা কাজ।" তিনি গানের খাতায় টোকা মারতে মারতে জোর দিয়ে বলেন, "কেবল কৌশল জানা থাকলেই চলবে না, তোমাকে আরও বেশী আবেগ আনতে হবে। আবার তুমি যেটা প্রকাশ করতে চাইছ সেটাও বোঝবার চেষ্টা করতে হবে। বুঝতে পারাটাই হচ্ছে মূল কথা।" তারপর যখন সান কোন একটি সুর ভালভাবে ব্যাখ্যা করে

দেয়, লিয়াং আনন্দে হেসে ওঠেন। তার অসুখের ব্যথা দূর হয়ে যায়। সে হাসি এত মধুর যে সান কখনও তা ভুলতে পারে না।

বনরক্ষীদের নানা রকম প্রচলিত চীনা গাছ-গাছড়ার ওষুধ প্রয়োগ এবং বন্ধুদের বিভিন্ন ধরণের প্রেসক্রিপসন দেওয়া সত্ত্বেও লিয়াংএর অবস্থা খারাপ হতে থাকে। কিন্তু মন ভেঙে পড়ার পরিবর্তে সানের উন্নতি দেখে লিয়াংএর আরাম বোধ হয়। তার জীবনের শেষ সময়ে তার জ্ঞান যে এ রকম একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপারে কাজে লাগছে এটাই তার সান্ত্বনা। "চার চক্র" এবং তার অসুখ হয়ত তার শরীরকে ধ্বংস করবে, কিন্তু তার অস্তিত্ব বেঁচে থাকবে সানের মধ্যে। সান সম্ভাবনাপূর্ণ। সে মন সঁপে দিয়েছে। সে ক্ষমতাশালী।

মৃত্যুর সময় তার মন পরিষ্কার হয়ে যায়। তিনি তার অসম্পূর্ণ কাজের কথাগুলো ভাবেন। তিনি তার বাঁশী সানকে দেন। এবং এই বনে বাস করার সময়ে তিনি যে সব সংগীত রচনা করেছিলেন তাও সানকে দিয়ে বলেন, "আমি সারা জীবন ধরে এগুলো নিয়ে কাজ ও লড়াই করেছি। তুমি এই বাঁশী দিয়ে অবশ্যই জনগণের সেবা করবে। কাজের থেকেই সংগীতের জন্ম হয়েছে। তাই সংগীতও শ্রমিকদের সেবা করবে। তুমি অনেক উন্নতি করেছ। তোমাকে আরও উন্নতি করতে হবে। তবেই তুমি একজন সংগীতজ্ঞ হতে পারবে। তোমাকে শ্রমিকদের মনের কথা প্রকাশ করতে হবে যাতে করে তারা যেন তোমায় ভালবাসে। সুতরাং আরও অভ্যাস করবে এবং কখনই হাল ছাড়বে না। আমার দুঃখ আমি তোমাকে শেষ পর্যন্ত শেখাতে পারলাম না। তবুও আবার বসন্ত আসবে ; ফুল ফুটবে এবং পাখীরা গান গাইবে। তারপর তুমি বেজিং যেও, সেখানে অন্য কেউ তোমাকে শেখাবে। কিন্তু মনে রেখো, তুমি যত সফলই হও কখনও নিজের প্রতিভা দিয়ে ব্যবসা করবে না। বুঝলে ?"

"হ্যাঁ", সান বলে। আবেগে তার গলা বুঁজে আসে। "আরে বোকা-ছেলে কাঁদে না। তোমাকে যা যা শিখিয়েছি সেগুলো মনে রেখো।" এ কথা বলে তিনি কেবল সংগীতের কথাই বোঝালেন না।

"নিশ্চয়ই !"

লিয়াং শান্তিতে চোখ বুঁজলেন। অন্যায়ভাবে তাঁর মৃত্যু হল। তার সাথে তাঁর প্রতিভা, তাঁর পার্টির প্রতি আনুগত্য, তাঁর না বলা কথা এবং তাঁর অসমাপ্ত কাজ সবই চলে গেল। বনের ছোট্ট কুঁড়ে ঘরে তাঁর শরীর পড়ে রইল।

কবরে শেষবার মাটি দেবার সময় বাতাস বয়ে গেল।

সে যে একজন "মানুষ" এ কথা ভুলে গিয়ে সান কবরের সামনের বার্চ গাছের উপর আছড়ে পড়ল এবং চিৎকার করে উঠল। সে তার চোখের জলের জন্য লজ্জা বোধ করল না; তার মধ্যে কোন দুর্বলতা নেই।

লিয়াং মাস্টার মশাই বার্চ গাছের নীচে শুয়ে আছেন, কিন্তু সান কখনও তাকে ভুলবে না।

ট্রেনে জানলার পাশের সীটে বসে আছে সান। কয়েক দিনের দীর্ঘ পথের যাত্রায় সে এক মুহূর্তের জন্যও চোখের পাতা ফেলেনি।

অন্ধকার রাতে যে গ্রামগুলো পার হয়ে যাচ্ছে তার আলোগুলোর দিকে তাকায় সান। সে দেখে যে পৃথিবী জেগে উঠছে। বন, মাঠ, পাহাড়, নদী ও হ্রদ সূর্যের আলোয় আরও সুন্দর হয়ে উঠছে। প্রতি মুহূর্তে সেগুলো আরও জীবন্ত হয়ে উঠছে। এই সব মাটির কথাই লিয়াং তার সংগীতের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন।

সান তার লম্বা বাঁশীর বাক্সটা চেপে ধরল, যেন সে তার সমস্ত আবেগ এর উপর ঢেলে দিচ্ছে। তার চিন্তা বহুদূরে ভেসে যাচ্ছে, কিন্তু সে সব সময়ই লিয়াং-এর চোখের আশার আলো দেখতে পাচ্ছে।

সে বেজিংএ এসে পৌঁছয়। তার সরল হৃদয় সাফল্যের আগ্রহ ও আশায় ভরে আছে। সংগীত-বিদ্যালয়ে সে নাম লেখাবার অফিসের দরজা খোলে। একজন ভদ্রমহিলা মিষ্টি হেসে প্রশ্ন করেন, "তোমার জন্য কি করতে পারি, খোকা?"

বেশ উৎসাহভরে সান উত্তর দেয়, "আমি নাম দিতে চাই।"

ভদ্রমহিলাটি খুব স্বাভাবিকভাবে উত্তর দেন, "তুমি খুব দেরী করে ফেলেছ। নাম দেবার সময় পার হয়ে গেছে।"

হতবাক সান হতাশায় একেবারে কেঁদে ফেলে আর কি। তারপর সে আবার আগ্রহভরে বলে, "কিন্তু আমি যে অনেক দূর থেকে এখানে এসেছি।"

"দেখ প্রাথমিক পরীক্ষা হয়ে গেছে এবং আজ শেষ পরীক্ষা হচ্ছে।"

"আমি কি শেষ পরীক্ষায় বসতে পারি?" তার আশা জেগে ওঠে।

"না, পার না। তারাই শেষ পরীক্ষায় বসেছে যারা প্রাথমিক পরীক্ষায়

পাশ করেছে। তুমি তো সেই পরীক্ষা দাও নি, সুতরাং কি ভাবে তুমি শেষ পরীক্ষায় বসবে ?"

তার আশা দূর হয়ে যায়। সে বোকার মতো সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে। সে জানে না এখন তার কি করা উচিত। এই বিরাট শহরে তার মতো একজন আগন্তুককে কে সাহায্য করবে ? কে বুঝবে তার কথা ?

ভদ্রমহিলা খুব সহানুভূতির সাথে বললেন, "আমি দুঃখিত। এই হচ্ছে আইন।" এখন আর তার মুখে হাসি নেই।

সানের ফিরে যাবার কোন ইচ্ছা নেই। এক একটা ঘর থেকে পিয়ানো, বেহালা, ক্ল্যারিওনেট এবং চীনা জাতীয় বাদ্যযন্ত্রের শব্দ ভেসে আসছে। তারপর সানের তীক্ষ্ণ কানে ধরা পড়ল একটা ঘর থেকে বাঁশীর করুণ সুর ভেসে আসছে। সান সেই সুর শুনে সেই ঘরের দিকে এগোতে শুরু করল। মনে হল যেন সে তার বন্ধুর ডাকে সাড়া দেবার জন্য এগোচ্ছে। কেউ তাকে থামাল না। নির্ব্বিকারভাবে সে ঘরের দরজা ঠেলে খুলে ফেলল। দরজাটা বিশ্রী শব্দ করে উঠল। সেই শব্দ শুনে ঘরের মধ্যে কোন একজন চমকে উঠলেন। সানের পশমের জ্যাকেট, পশমের টুপী ও জুতো পড়া চেহারাটা খুবই অদ্ভুত।

ঘরের একপ্রান্তে একটা ডেস্কের পেছনে বসে আছেন পরীক্ষকেরা। প্রধান পরীক্ষক অধ্যাপক ফ্যা তাও, প্রবেশকারীর দিকে তাকালেন। যে মেয়েটি বাঁশী বাজাচ্ছে সে ছাড়া অন্য ছ'জন প্রতিযোগী দেয়ালের কাছে বসে আছে। মেয়েটি বেশ ভাল বাজাচ্ছে এবং সে মাঝে মাঝে কিছু মৌলিক কাজও দেখাচ্ছে। ক্রমে ক্রমে এই পরিচিত সুর তার চিন্তার মধ্যে ঢুকে গেল। সান তার দুর্ভাগ্যের কথা ভুলে গেল। মেয়েটি বাজানো শেষ ক'রে, পরীক্ষকদের নমস্কার ক'রে নিজের জায়গায় গিয়ে বসল। তারপর সান শুনল কে যেন বেশ কড়া গলায় তাকে প্রশ্ন করছেন, "তুমি ভেতরে ঢুকলে কেন ?" সান তাদের রাগী দৃষ্টির সামনে কেমন যেন ঘাবড়ে গিয়ে তাদের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। "খোকা তুমি এখনই চলে যাও। এখানে পরীক্ষা চলছে।"

সান মাপ চেয়ে বলল, "আমি ক্ষমা চাইছি। আমিও পরীক্ষা দেব।"

বিস্মিত অধ্যাপকেরা নীচু গলায় বলাবলি করতে লাগলেন।

"কে তাকে এভাবে ভেতরে ঢুকতে দিল ?"

"এ হতে পারে না! এ এল কোত্থেকে?"

"কি ঝামেলা!"

তারপর অধ্যাপক ধৈর্য সহকারে বোঝালেন, "নাম দেবার সময় পার হয়ে গেছে এবং শেষ পরীক্ষাও প্রায় শেষ।'

এদের নির্বিকার কথায় সান মনে ব্যথা পেল। লজ্জায় লাল হয়ে উঠে সে বিড়বিড় করে বলল, "যদি সংগীত বিদ্যালয়ে ঢোকাই শুধু আমার উদ্দেশ্য হত তাহলে আমি এতক্ষণে চলে যেতাম।" সে ইতিমধ্যে ঘামতে শুরু করেছে এবং এমনই বিব্রত বোধ করেছে যে সে আর তার মনের কথা বলতে পারল না। তার ইচ্ছে করল এখুনি সে এখান থেকে চলে যায়।

"সামনের বছর আবার চেষ্টা ক'র। এখন 'চারচক্র' শেষ হয়ে গেছে। প্রতিভাধব ছাত্ররা প্রতি বছরেই নাম লেখাতে পারবে। তুমি এবার যাও, কেমন। তোমার জন্য পরীক্ষা বন্ধ হয়ে আছে।"

সান পাথরের মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল: চলে যাওয়া সহজ। কিন্তু সে যে এতদূর থেকে এখানে এসেছে তা কেবলমাত্র তার নিজের জন্য নয়। না, সে যাবে না। তাকে লিয়াং এর ইচ্ছা পূরণ করতে হবে। ফিরে গেলে চলবে না। লিয়াং যা অসম্পূর্ণ রেখে গেছেন তাকে তা পূরণ করতে হবে।

লজ্জিতভাবে কিন্তু দৃঢ়তার সাথে সান তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "আমার বাড়ি হাজার কিলোমিটারেরও বেশী দূরে। কিন্তু আমি এখানে এসেছি কারণ চারচক্রের পতন হয়েছে। দয়া করে আপনারা আমার কথা শুনুন। আমাকে কেবল একটা সুর বাজাতে দিন। না হলে আমার এতখানি পথ আসা বৃথা হয়ে যাবে।" তার চোখ জলে ভরে উঠল।

অধ্যাপক ফ্যু এই অদ্ভুত শক্ত ছেলেটার দিকে বিশেষভাবে তাকালেন। ছেলেটির হাতের একটা কোণা ছেঁড়া বাঁশীর বাক্স কোন এক বিশেষ কারণে তার মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। তাঁর মনে হল তিনি যেন এটা আগে কোথাও দেখেছেন। হয়ত ছেলেটি বিশেষ কেউ। তিনি কি তাকে একবার বাজাতে দেবেন?

হয় সানের বিষন্ন অবস্থা না হয় তার দৃঢ়তা এই দুটোর যে কোন একটার জন্য অবশেষে সাতজন প্রতিযোগীর মনেও সহানুভূতি জেগে উঠল। তারাও অনুরোধ করে বলে উঠল, "আপনারা দয়া করে ওকে বাজাতে দিন।"

সান আশ্বস্ত বোধ করল। তাদের সহানুভূতি তাকে অভিভূত করেছে।

এবং তখনই কেবল সে এই অপরিচিত পরিবেশে বেশ স্বস্তি বোধ করল। প্রতিযোগীরা অবশ্যই জানে যে তাদের মধ্যে কেবল তিনজনকে মাত্র বাছাই করা হবে এবং সান এলে তাদের সুযোগ আরও কমে যাবে। সাতজনের মধ্যে থেকেই নির্বাচন করতে পরীক্ষকেরা হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন। ওরা প্রত্যেকেই খুব ভাল বাজিয়ে। কিন্তু তাদের নিঃস্বার্থ মনোভাবে অভিভূত হয় পরীক্ষকেরা সানকে বাজাবার সুযোগ দিতে রাজী হলেন।

সান তার পশমের জ্যাকেট ও টুপী খুলে ফেলল। কৈশোরের জড়তা নিয়ে সান পরীক্ষকদের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল। যেন সে বলতে চাইছে, "আমি কি শুরু করব ?" অধ্যাপক মাথা নাড়লেন এবং ভাবলেন ছেলেটি সত্যিই একজন ভাল বাজিয়ে হবে! সান বাজাতে শুরু করল। সলজ্জ তার বাজনা, যেন সে তার শ্রোতাদের চমকে দিতে ভয় পাচ্ছে। একজন পরীক্ষক তার চেয়ারে বসে চঞ্চল হয়ে উঠলেন, কি সব আজেবাজে বাজনা হচ্ছে।

সংগীতে ডুবে গিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই সান ভুলে গেল সে কোথায় রয়েছে। সে বিশাল বন নিয়ে, পাহাড়ের বরফ ঢাকা কুঁড়ে ঘর নিয়ে, সেই কুঁড়ে ঘরের বরফ জমা জানলার উপরে সূর্যের আলো পড়ে যে দীপ্তিচ্ছটার বিকিরণ হচ্ছে তা নিয়ে বাঁশী বাজাতে লাগল ; সে তার ঘর নিয়ে বাজাতে লাগল, যে ঘরে তার শ্রদ্ধেয় মাস্টার মশাই শান্তিতে বিশ্রাম করছেন।

তার উজ্জ্বল অথচ অমার্জিত সুরে, কবিতার মতো সুরের ঝংকারে অধ্যাপক অভিভূত হয়ে পড়লেন। অধ্যাপক বহু খ্যাতনামা সংগীতজ্ঞের সংগীত শুনেছেন কিন্তু তিনি এই বালকের বাজনা শুনে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। অধ্যাপক যখন ভাবতে লাগলেন যে কে এই বালককে সত্য ও সুন্দরের সন্ধান করতে শিখিয়েছেন এবং প্রেরণা দিয়েছেন, তখন সানের কথা তার মন থেকে সরে গেল। ভাষা যে কথা বলতে পারে না এই সংগীত তাই বলছে।

এই বালককেই তিনি প্রায় তাড়িয়ে দিচ্ছিলেন, এ কথা ভেবে অধ্যাপকের মনে অপরাধ বোধ জাগল। এই ছেলেটি একদিন বিশ্বের সেরা সংগীতজ্ঞ হয়ে উঠতে পারে। কেবল আইন মেনে চললে এই অবস্থাই হয়।

ছেলেটি তো গ্রাম থেকে এসেছে, তবে কোথায় সে এমন কঠোর ও মৌলিক শিক্ষা পেল ? এই সংগীতের কিছু কিছু অংশ তার পরিচিত। ছেলেটির বাজনা এবং এই ছেঁড়া বাঁশীর বাক্স তাকে আর একজনের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু কে সে ? বিস্তীর্ণ নির্জন প্রান্তর থেকে একটা আবছা



পৃষ্ঠা — ১০৭

কণ্ঠস্বর যেন তাকে ডাকছে……। হঠাৎ তার মনে এই চিন্তাটা খেলে গেল, আর তখনই তিনি সম্বিত ফিরে পেলেন। তার মনে পড়ল যে তিনি পরীক্ষা নিচ্ছেন। অন্যমনস্ক হয়ে পড়ার জন্য তিনি নিজেকে ধিক্কার দিলেন। তিনি ভুলে গেলেন যে তিনি প্রধান পরীক্ষক। যেন তিনি কোন অনুষ্ঠান শুনছেন এইভাবে বলে উঠলেন, "তুমি আর একটা সুর বাজাও।"

সান সহজভাবে একের পর এক সুর বাজিয়ে চলল। তার চোখের সামনে তখন বসন্তের মৃদু বাতাসে ঝির ঝির করে কাঁপছে বার্চ গাছের পাতা। পরীক্ষা কেন্দ্রের রূপ পাল্টে গেল। কারণ সকল পরীক্ষার্থী ও পরীক্ষকদের চোখের সামনে মনোরম সব দৃশ্য ভেসে উঠছে। এই সব দৃশ্য যে প্রত্যেকেই দেখেছেন। অবশেষে সংগীত শেষ হল। সমস্ত ঘর নিঃশব্দ, নীরব। সমস্ত ঘরে যে ভাবের সৃষ্টি হয়েছে, একটি সুখী পৃথিবীর জন্য যে বিশুদ্ধ কামনার সৃষ্টি হয়েছে তাকে কেউ নষ্ট করতে চায় না।

এই নীরবতায় ঘাবড়ে গিয়ে ও বিরক্ত হয়ে সান তার পা ঘসতে আরম্ভ করল। সে কি তার শিক্ষকের নাম ডোবাল? সে যে সুর ভালবাসে তা কি এদের হৃদয় স্পর্শ করতে পারে নি? তার বাজনার ভিতর দিয়ে লিয়াং-কে বাঁচিয়ে রাখার ইচ্ছাকে পূরণ করতে না পারার জন্য সানের খুব রাগ হল।

এই নীরবতাকে খান খান করে দিয়ে সমস্ত পরীক্ষার্থী চিৎকার করে বলে উঠল, "ওর বাজনা আমাদের সকলের চেয়ে ভাল!"

"হ্যাঁ, ও শ্রেষ্ঠ!"

"ওকে ভর্তি করে নিন!"

পরীক্ষকেরা সাত জন পরীক্ষার্থীর দিকে তাকালেন। এরা চীনের বিভিন্ন স্থান থেকে এসেছে অথচ এদের প্রত্যেকের মনের ইচ্ছায় কি মিল। এরা নিষ্পাপ, একনিষ্ঠ ও নিঃস্বার্থ যুবশক্তি।

এদের কথা শুনে সানের আশা জেগে উঠল। কিন্তু সে প্রতিবাদ করে উঠল, "না আমাকে না! আপনারা সংগীতকে প্রশংসা করুন!"

অধ্যাপক তার বিনয়কে বুঝতে পারলেন। তিনি প্রশ্ন করলেন, "বলতো, কে তোমাকে এই সুরগুলো শিখিয়েছেন? আমি এ সুর আগে কখনও শুনিনি।"

"আমার মাস্টার মশাই শিখিয়েছেন।"

"আচ্ছা? তিনি এখন কোথায়?"

"বনে।"

"বনে?" তিনি পাল্টা প্রশ্ন করলেন। বিস্তীর্ণ নির্জন প্রান্তরে আবছা কণ্ঠস্বরটা যেন হঠাৎ একটা পরিচিত রূপ পেল। সে কি তিনি? এই ছেলেটি কি তাঁর ছাত্র? এ রকম একটি যোগাযোগ কি সম্ভব? তার হৃদয়ে যন্ত্রণা ও ক্রোধ জমা হতে লাগল। তিনি সানের দিকে গভীরভাবে তাকালেন। তার প্রতিটি নড়াচড়াকে মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগলেন যেন তিনি তার একটি শব্দও শুনতে অসমর্থ না হন, যেন তার ভয় হচ্ছে সান হয়ত এখুনি অদৃশ্য হয়ে যাবে।

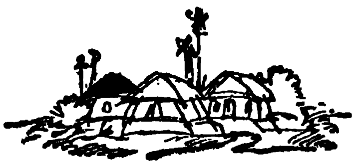
বাঁশীটা তুলে নিয়ে সান সংক্ষেপে বলল, "আমি এই সুরটা আমার মাস্টার মশাইয়ের জন্য বেঁধেছি।" সুরটা মোটা দাগের ও সরল, এর উত্থান পতনও খুব আকস্মিক, তবুও এর মধ্যে দিয়ে প্রকাশ হচ্ছে ক্রুদ্ধ ধিক্কার। এর স্মৃতি এতই বেদনাদায়ক যে তা সকলকেই অভিভূত করে ফেলল। সানের গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল বেদনার অশ্রু। সে তার বাঁশীটা অধ্যাপকের টেবিলের উপর রাখল। তারপর তার ঝোলা থেকে এক গাদা স্বরলিপি বের করল। "আমার মাস্টার মশাই আমাকে এগুলো দিয়ে গেছেন", সে বলল।

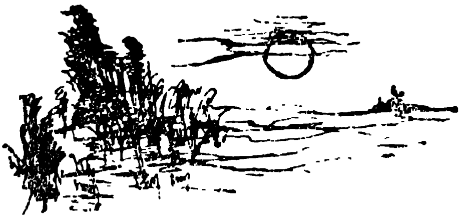
সেই স্বরলিপির ওপরে অধ্যাপক দেখলেন তার পরিচিত হরফে লেখা নাম লিয়াং কুইমিং। তা হলে ইনিই সেই ব্যক্তি। এখন তার মনের ভাব বর্ণনা করা যায় না। তার মনে হল যে তাঁর সাথে দেখা হল এবং আবার বিচ্ছেদ হয়ে গেল। লিয়াং ছিলেন তার সবচয়ে প্রিয় বন্ধু, এবং তার সমসাময়িক লোকেদের মধ্যে সবচেয়ে প্রতিভাশালী সংগীতজ্ঞ। এখন তিনি মৃত। তাদের দু'জনের মধ্যে আর কখনও দেখা হবে না। তিনি লিয়াং-এর বাঁশী ও স্বরলিপিগুলো ছুঁয়ে দেখলেন। এগুলোই সেই প্রতিভাধর, কর্মঠ ও আদর্শের প্রতি অনুগত লিয়াংএর শেষ স্মৃতি। এই কি শেষ কথা? তার চোখ জলে ঝাপসা হয়ে গেল। তিনি অশ্রুসিক্ত চোখে সানের দিকে তাকলেন। তারপর হাত ধরে সানকে কাছে টেনে নিলেন। সেই বার্চ গাছের নীচে জীবন শেষ হয়ে যায় নি। স্মৃতি চিরতরে মুছে যায় নি। এই বালক ও তার সুরের মধ্যে দিয়ে লিয়াং-এর জীবন প্রবাহিত হবে।

সে রাতে উষ্ণ জলে স্নান করার পর সান অধ্যাপকের বাড়িতে নরম বিছানার উপর উঠে বসে। পর্দার ফাঁক দিয়ে সে আকাশের মিটি মিটি তারাগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে।

সে যখন গুটিসুটি মেরে শুতে যাবে, সেই সময়ে কে যেন তার ওপরে ঝুঁকে প্রশ্ন করল, "তোমার কি ঠাণ্ডা লাগছে?"

"না। ধন্যবাদ, বিছানা বেশ গরম আছে।" সে তার ঘুমন্ত চোখ দুটো খোলে। তার শরীর জুড়ে থাকে উষ্ণ আমেজ। সে চোখ বন্ধ করে এবং তার দু চোখ জুড়ে ঘুম নেমে আসে। তখনই তার লিয়াং-এর একটা কথা মনে পড়ে যায়, "তুমি সব সময়ে অবশ্যই তোমার বাঁশী দিয়ে জনগণের সেবা করবে।"





মোরগ হল ফিনিক্স পাখী

হো ওয়াই

নল খাগড়ায় ভরা জলা জমির মধ্যে এসে পড়েছে একটা ঘোলা জলের নালা। সেই জলার পাশে একটা বেগনি রংয়ের মুরগী তার বাসাতে পনেরোটা ডিমের উপর বসে তা দিচ্ছিল।

সে নিজের শরীরটা টানটান করে বলে উঠল, "কুড়ি দিন হয়ে গেছে; আর একটা দিন গেলেই আমার প্রিয় বাছারা সব ডিম ফুটে বেরোবে। বড় হলে ওরা যে কেমন দেখতে হবে?"

ঠিক তখনই একটি ফিনিক্স পাখী গান গাইতে গাইতে উড়ে গেল। তার সুন্দর পালক ঝকমক করে উঠল।

মুরগীটা প্রশংসার চোখে ওপরের দিকে তাকাল।

"পাখীটা কি সুন্দর। যদি আমার বাছারা ফিনিক্স পাখী হয়ে ওঠে!" একটা উদ্ভট চিন্তা তার মাথায় এল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে নিজেকে ধিক্কার দিল। "কি বাজে চিন্তা। ও একটা জাদু পাখী, আর আমরা হলাম সাধারণ মুরগী। একটা মুরগী কি করে ফিনিক্স হবে? এ রকম বোকার মতো আজে বাজে চিন্তা করা উচিত নয়।"

অবশ্য সে তার বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা না করে পারল না।

যখন সে এ রকম দিবা-স্বপ্ন দেখছে, তখন একটা শয়তান সাপ সেই ঘোলা জল থেকে বেরিয়ে এল। সাপটা দেখল যে মুরগীটা চিন্তায় বিভোর হয়ে আছে। সে তার চেরা জিভ লিক্ লিক্ করতে করতে সেই হতভাগা পাখীটার দিকে লোভীর মতো তাকিয়ে রইল।

সে নীরবে হামাগুড়ি দিয়ে মুরগীর বাসার কাছে গেল এবং এক ছোবলে মুরগীটাকে শেষ করে দিল। তারপর একে একে সে ডিমগুলো গিলতে আরম্ভ

করল। এভাবে সে চোদ্দটা ডিম গিলে ফেলল। যেই সে বিরাট হা করে শেষ ডিমটা গিলতে যাবে অমনি একটি প্রকাণ্ড পাখী আকাশ থেকে বিদ্যুতের গতিতে নেমে এসে ছোঁ মেরে সাপটাকে তুলে নিয়ে গেল। পাখীটা আকাশের অনেক উঁচুতে উঠে গিয়ে তার সমস্ত শক্তি দিয়ে সাপটাকে মাটির দিকে ছুঁড়ে দিল।



শয়তান সাপের যা হওয়া উচিত তাই হল।

এই বিরাট পাখীটা আর কেউ নয়—সেই ফিনিক্স পাখী।

পাখীটা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, "ইস যদি আমি একটু আগে আসতাম। বড় মুরগীটা তো গেলই, আর কেবল মাত্র একটি ডিম বেঁচে আছে। এখন কি করি?"

ডিমটাকে ভালভাবে পরীক্ষা করে সে খোলার মধ্যে একটা শব্দ শুনতে পেল।

"মা মরা এই হতভাগা বাচ্চাটা শিগ্‌গিরিই ডিম ফুটে বেরোবে। আমি ওকে না বাঁচালে ও আবার বিপদে পড়বে," সে ভাবল।

তারপর সে ধাইমার মতো ডিমটার উপরে বসে তা দিতে আরম্ভ করল। পরের দিন খুব ভোর বেলা সেই ডিম ফুটে একটা তুলতুলে বাচ্চা মোরগ বেরিয়ে এল।

"মা! মা!" সেই খুদে মোরগটা কিচির মিচির করে ডেকে উঠল।

"আহারে বাছা আমার!" ফিনিক্স পাখীটা তার ডানা দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরল। তারপর তার ঠোঁট থেকে কয়েকটা দানা ওকে খাইয়ে দিল।

এ ভাবে পাঁচ পাঁচটা দিন কেটে গেল। মোরগটা বেশ বড় ও শক্ত-সমর্থ হয়ে উঠল। ও এখন দৌড়তে, লাফাতে ও ডানা ঝাপটাতে পারবে এবং নিজেই নিজের খাবার খুঁজে নিতে পারবে।

"মা, আমি তোমার মতো দেখতে হলাম না কেন মা?" সে ফিনিক্সের গা ঘেঁসে বোকার মত প্রশ্ন করল।

মুচকি হেসে ফিনিক্স উত্তর দিল: "কারণ তুই মোরগ।" একটু পরে সে আরও বলল, "সত্যি কথা কি জানিস বাছা? আমি তোর মা নই। তোর মা হল বেগনি মুরগী।"

"তাহলে, আমার সেই মা কোথায়?"

"একটা শয়তান সাপ ওকে মেরে ফেলেছে।"

"তাহলে আমিও সেই খুনীকে খুন করব!" কাঁদতে কাঁদতে মোরগ এই প্রতিজ্ঞা করল।

"প্রাণের বাছা আমার কাঁদে না, কাঁদে না! আমি ওকে শাস্তি দিয়েছি—ওকে মেরে ফেলেছি।" ফিনিক্স ওকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে। "চারিদিকে অনেক শয়তান সাপ ও অনিষ্টকারীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওরা আমাদের পরম শত্রু।"

মোরগ তাদের সকলকে খতম করার প্রতিজ্ঞা করল।

"ঠিক বলেছিস খোকা। সাবাস!"

"আমি তো মোরগ, তুমি কোন্ পাখী?" সে প্রশ্ন করে।

"আমি ফিনিক্স পাখী।"

"সেটা কি?"

"যে পাখী অন্য পাখীদের সুখী করতে সাহায্য করে।" তার ধাইমা ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলল।

"ফিনিক্স মা, আমি বড় হয়ে তোমার পথ অনুসরণ করব," মোরগ ঘোষণা করল।

মহা আনন্দে ফিনিক্স বলল, "চমৎকার!" আমিও ফিনিক্স পাখী হয়ে জন্মাই নি। আমি একটি অতি সাধারণ পাখী ছিলাম। তুই যদি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হোস, তবে তুইও সফল হবি। আমি কাল তোকে ছেড়ে চলে যাবো। কারণ আমার অনেক কাজ পড়ে আছে। তোকে কিন্তু তোর নিজেরই দেখাশোনা করতে হবে।"

"আমি এখন কি করব?" বাচ্চা মোরগটার মন খুব খারাপ হয়ে গেল।

"চিন্তা করিস না। সব ঠিক হয়ে যাবে। দেখ, তোর এক জোড়া ডানা আছে। তুই যদি ডানা না ঝাপটাস তাহলে কখনই ও দুটো শক্ত হবে না এবং তুইও উড়তে পারবি না। তাছাড়া তোর ঠোঁট ও থাবা আছে। ও গুলোই আমাদের অস্ত্র। ওগুলো সব সময়ই চোখা রাখবি এবং ব্যবহার করতে শিখবি। কেবল বাসায় বসে থাকলে বা আমার গা ঘেঁসে বসলেই যে তুই ফিনিক্স হয়ে উঠবি তা কিন্তু নয়। না, এখন থেকে তুই নিজেই নিজের দেখাশোনা করবি ও বাস্তব জগতের মোকাবিলা করবি। যেখানেই যাস না কেন, সবসময়ই অন্যদের সাহায্য করিস। এবার তোকে আমি উড়তে শেখাব। যদি তুই অনেক দূর উড়তে পারিস তবে তুই আর মোরগ থাকবি না।"

ফিনিক্স ধৈর্য্য সহকারে মোরগকে উড়তে শেখাল। তার পক্ষে এটা খুবই কঠিন কাজ, কিন্তু তবুও সে বার বার চেষ্টা করতে লাগল। এবং বেশ কয়েকবার বাজে ভাবে পড়ে গিয়ে তার খুব ব্যথা লাগে।

ফিনিক্স তার একনিষ্ঠতা দেখে খুব খুশী হয়। সে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবার পর ফিনিক্স তাকে কিভাবে ঠোঁট ও নখ ব্যবহার করতে হয় তা শেখায়। মোরগ ক্লান্ত, অবসন্ন হয়ে পড়া সত্বেও বার বার অভ্যাস ক'রে চলে, কিছুতেই থামে না।

ফিনিক্স আনন্দের সাথে বলে, "এভাবে চেষ্টা করলে তুই নিশ্চয়ই সব কিছু ভালভাবে শিখতে পারবি।"

পরের দিন ফিনিক্স পাখী উড়ে চলে যায়। মোরগ নিজেকে খুব অসহায় বোধ করে, কিন্তু কাঁদে না।

সে উড়তে শেখা এবং ঠোঁট ও নখ চালানো অভ্যেস করতে থাকে।

এইভাবে দিন কেটে যায়। ক্রমে ক্রমে সে প্রথমে ঝোপের ওপর দিয়ে, পরে পাইন গাছের জংগলের ওপর দিয়ে, তারও পরে হ্রদের উপর দিয়ে এবং শেষ পর্যন্ত উঁচু পাহাড়ের ওপর দিয়ে ভালভাবে উড়ে যেতে আরম্ভ করে। তার ঠোঁট এত শক্ত ও চোখা হয়ে ওঠে যে সে এখন বাদাম ভাঙতে পারে। গাছের ডাল ভাঙতে পারে, এমন কি গাছের উপর গর্ত পর্যন্ত করতে পারে। তার থাবা দিয়ে সে এখন ছোঁ মেরে খাবার তুলে নিতে পারে, পাথর বা ছোট-খাটো প্রাণীও ধরে নিয়ে উড়ে যেতে পারে।

তার ধাইমার উপদেশ অনুসারে সে তার বাসা ছেড়ে অসীম আকাশে যে সব পাখী আছে তাদের সাথে যোগ দেয়।

ঘোলা জলের নালার উপরে চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে সে আকাশের উঁচু, আরও উঁচুতে উঠে যেতে যেতে বলে, “বিদায়, আমার কি নীড়, বিদায়।” এভাবে উঠতে উঠতে সে দূর আকাশে একটি আবছা কালো বিন্দুতে পরিণত হয়।

একটি হ্রদের উপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় সে জলেতে তার প্রতিবিম্ব দেখতে পায়। তার মাথায় রয়েছে একটি চমৎকার ঝুঁটি। তার ঘাড় ও গালের পালক সবুজ রংয়ের, চোখ পিঙ্গল, এবং শরীরের পালকে রয়েছে উজ্জ্বল বর্ণচ্ছটা। তার লেজ ফেজেণ্ট পাখীর লেজের মতোই চমৎকার।

বহু লেক ও পাহাড়ের উপর দিয়ে সে অনেক দূরে উড়ে যায়। খিদে পেলে বিস্বাদ গাছপাতা খায় এবং তেষ্টা পেলে ঠাণ্ডা জল পান করে। রাত্রে কোন উঁচু পাহাড়ে বসে বিশ্রাম করে। তার ডানা জোড়া আরও শক্ত হয়ে ওঠে, দৃষ্টি প্রখর হয় এবং তার ঠোঁট ও থাবা আরও শক্তিশালী হয়ে উঠে।

একদিন একটি গ্রামের উপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় সে একটি মুরগীকে দেখতে পায়। তার অনেকগুলো বাচ্চা রয়েছে। তারা এক গাদা ঘাস আঁচড়ে খাবার খুঁজছে। মুরগীটা তার থাবা দিয়ে ঘাস ছিটিয়ে তার ভেতর থেকে মোটা মোটা পোকা বার করছে। এবং তার বাচ্চারা সেগুলো মহা আনন্দে হৈচৈ করে খাচ্ছে।

হঠাৎ একটা বাজ পাখী সেখানে উপস্থিত হল। বাজটা তাদের উপর

দিয়ে কয়েক বার চক্কর মেরে বিদ্যুতের গতিতে শিকারের উপর ছোঁ মারল। ভয়ে চিৎকার করে মুরগীটা তার ডানা ঝাপটাতে থাকে এবং সন্ত্রস্ত বাচ্চাগুলো তার ডানার নীচে লুকোবার জন্য হুটোপুটি আরম্ভ করে দিল।

তাদের বিপদ দেখে সেই মোরগটা, যে ফিনিক্স পাখী হতে চায়, সেই বাজ পাখীকে অনুসরণ করছিল। যেই বাজপাখীটা মুরগীটার দিকে থাবা বাড়াতে যাবে, অমনি সে তার মাথার উপরে বাতাসের ঝাপটা অনুভব করে। বিস্ময়ে বাজটা ওপরের দিকে তাকাতেই সেই সাহসী মোরগটা তার একটা চোখ ঠুকরে দেয়। বাজটা যন্ত্রণায় চিৎকার করে ওঠে। তার চোখ দিয়ে রক্ত ঝরে পড়তে থাকে। মরীয়া হয়ে বাজটা সেই মোরগকে ধরতে চেষ্টা করে, কিন্তু মোরগটা তাকে এড়িয়ে গিয়ে তার অন্য চোখে ঠোকর মারে। বাজটা অন্ধের মতো বাতাসে ডানা ঝাপটাতে থাকে। তখন মোরগটা আবার তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তার মাথায় এমন জোরে আঘাত করে যে সে পাথরের মতো মাটিতে আছড়ে পড়ে।

মুরগী এই সব দেখে তার প্রাণরক্ষাকারীকে অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল, কিন্তু মোরগ অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলল, "এ কিছু নয়। আমি যতটুকু পেরেছি, করেছি।"

এই বলে মোরগ আবার যাত্রা করল এবং একটি পাহাড়ের কোলে একটি হ্রদের কাছে এসে উপস্থিত হল। সেখানে আবহাওয়াটা হঠাৎ পাল্টে গেল। ঝড় উঠল এবং আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে গেল। হ্রদের নীল জল কালো হয়ে গেল। আর মনে হতে লাগল যে বিশাল বিশাল ঢেউগুলো বুঝি হ্রদের মাঝে অবস্থিত দ্বীপটাকে গ্রাস করে ফেলবে। মুষলধারে বৃষ্টিও আরম্ভ হয়ে গেল।

ঝড়কে উপেক্ষা করে, জলে ভিজে ও হাওয়ায় বিধ্বস্ত হয়ে মোরগ উড়ে চলল। সে তার ডানায় সমস্ত শক্তি জড়ো করে হ্রদের অপর দিকে যাবার চেষ্টা করতে লাগল। অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও সে তখনও পৌঁছতে পারল না।

এমন সময় সে শুনতে পেল কে যেন হ্রদের মধ্যে থেকে সাহায্য চাইছে। কেউ নিশ্চয়ই হ্রদের মধ্যে পড়ে গেছে, সে ভাবল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে উত্তাল জলে খোঁজাখুজি করার পর সে দেখল যে একটা কাঠঠোকরা পাখী জলের মধ্যে বাঁচার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। পাখীটা হয়ত এখুনি ডুবে যাবে।

মোরগ পাখীটাকে বাঁচাবার জন্য নীচে নেমে এল এবং তার থাবা দিয়ে

ওকে তুলে ধরল, কিন্তু একটা বিরাট ঢেউ এসে ওদের দুজনকে ডুবিয়ে দিল। বিপদের মধ্যে পাখীটাকে বাঁচাবার জন্য দৃঢ় পণ করে মোরগ তার থাবা দিয়ে ওকে আরও শক্ত করে ধরল এবং সমস্ত শক্তি দিয়ে কাঠঠোকরাকে জল থেকে তুলে নিল। পাখীটাকে নিয়ে সে দ্বীপের দিকে উড়ে গেল। দ্বীপের একটা গাছের উপরে সে পাখীটাকে নিরাপদে রাখল।

প্রাণ রক্ষা করার জন্য কাঠঠোকরাটি তার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলল, "আমি একটা গাছ থেকে পোকা ঠোকরাচ্ছিলাম। এমন সময় একটা প্রবল বাতাস এসে আমাকে হ্রদের জলে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তুমি না থাকলে আমি ডুবে যেতাম। আমাকে বাঁচাবার জন্য তোমাকে যে কী বলে ধন্যবাদ দেব।"

"এ কিছু নয়। আমি যতটুকু পেরেছি, করেছি।"

ঝড় থেমে গেলে হ্রদের বুকে আবার নীল আকাশের প্রতিবিম্ব দেখা গেল। মোরগ কাঠঠোকরার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে উড়ে গেল। দিনের বেলায় সে বন, তৃণভূমি, পাহাড় অথবা সমুদ্রের তীরে উড়ে বেড়ায়। রাত্রে পাহাড়ের উপরে অথবা পর্বত শিখরে ঘুমোয়। আবহাওয়া যে রকমই থাকুক না কেন এবং যে ঋতুই হোক, যেভাবেই পারে সে অন্য পাখীদের সাহায্য করে।

এমনি ভাবে দিন কেটে যায়। একদিন সে দেখে একটি বনের প্রান্তে একটা উঁচু গাছের ডালে বসে একটি ওরিয়েল পাখী কাঁদছে।

"তুমি কাঁদছ কেন? তোমার কি হয়েছে?" মোরগ তাকে প্রশ্ন করে।

"আমি আমার বাচ্চা মেয়েটাকে খুঁজে পাচ্ছি না।" ওরিয়েল উত্তর দেয়। "সব জায়গায় খুঁজলাম, কিন্তু পেলাম না। আমার ভয় হচ্ছে কোন শেয়াল বা ঈগল পাখী ওকে ধরেছে।"

"কোন চিন্তা করো না। ওকে খুঁজে বার করার জন্য আমি তোমায় সাহায্য করব এবং হয়ত ওকে আমরা খুঁজে বার করতেও পারব।" এ কথা বলে সে বনের মধ্যে উড়ে গেল।

খুঁজতে খুঁজতে মোরগ একটি ঘুঘু পাখীর দেখা পেল এবং তাকে জিজ্ঞেস করল, "ওরিয়েল পাখী ওর মেয়েকে খুঁজে পাচ্ছে না। তুমি কি ওকে দেখেছ?"

ঘুঘু পাখী দেখেনি, কিন্তু সে পরামর্শ দিল, "তুমি বরং স্কাইলার্ক পাখীকে জিজ্ঞেস কর। সে সব সময় আকাশের অনেক উঁচুতে উঠে খেলা করে

এবং গান গাওয়া পাখীদের সাথে বন্ধুত্ব করে। সেই হয়ত বলতে পারবে বাচ্চা ওরিয়েল পাখী কোথায় আছে।"

মোরগ সাদা মেঘের নীচে স্কাইলার্ক পাখীর দেখা পেল এবং তাকে সেই হারিয়ে যাওয়া পাখীটার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ, আজ সকালে ওর সংগে আমার দেখা হয়েছিল। আমরা এক সাথে খেলা করেছি, গান গেয়েছি। তারপর ও পশ্চিমের দিকে চলে গেছে।"

মোরগটি সেই দিকে যেতে লাগল। অবশেষে সে দেখতে পেল একটা বন থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে।

"আরে! বনে আগুন লেগেছে! সকলকে ডেকে এখুনি আগুন নেভাতে হবে।"

ঠিক তখনই সে সাহায্যের জন্য একটি চিৎকার শুনতে পেল। কে যেন সেই ধোঁয়ার মধ্যে আটকে গেছে। এখন সময় নষ্ট করা যায় না। সে দ্রুত সেই ধোঁয়ার মেঘের মধ্যে ঢুকে গেল। সে দেখতে পেল যে সেই হারিয়ে যাওয়া বাচ্চা ওরিয়েল পাখীটা ধোঁয়ায় প্রায় দম আটকিয়ে পাগলের মতো ডানা ঝাপটাচ্ছে। তাকে তার থাবার মধ্যে শক্ত করে ধরে সে মুক্ত বাতাসের মধ্যে উড়ে গেল।

মোরগ সেই বাচ্চাটাকে বলল, "জায়গাটা খুবই বিপজ্জনক। তোমার মা বনের প্রান্তে তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছে। তুমি যাও! দেরী কোর না।"

তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে বাচ্চা পাখীটা চলে গেল। মোরগ সতর্ক-ধ্বনি করল। সেই বনে হাজার হাজার পাখী ও প্রাণী বেরিয়ে এসে বালি ও গাছপালা দিয়ে আগুন নেভাতে লাগল। মোরগ নিজেকে জলে ভিজিয়ে গায়ের জল ঝেড়ে একটি জ্বলন্ত গাছকে নেভাতে চেষ্টা করল।

বার বার সে এরকমভাবে চেষ্টা করে যেতে লাগল। অবশেষে তার পালক পড়ে যেতে লাগল এবং তার বুকও বেশ পুড়ে গেল। সারাক্ষণ কাজ করে সে অন্যদেরকে উৎসাহ দিতে লাগল।

তার সারা শরীর ব্যথা করতে লাগল। তার চোখ জ্বালা করতে লাগল এবং গলা শুকিয়ে এল। একেবারে ক্লান্ত, অবসন্ন হয়ে পড়া সত্বেও সে চেষ্টা করে যেতে লাগল। তখনও আগুন জ্বলছে। সে তার পালক ভিজিয়ে

আগুনের শিখার ভেতর ঢুকে গেল। কিন্তু এবার সে আর পারল না। সে অজ্ঞান হয়ে সেই অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে পড়ে গেল।

সকল পাখী ও প্রাণীরা শিউরে উঠল। তারা সকলে তাদের এই সাহসী বন্ধুকে হারিয়ে কেঁদে ফেলল। তারপর সেই মোরগ সেই আগুন থেকে বেরিয়ে আকাশে উঠে গেল। তার রূপান্তর ঘটেছে। এখন তার শরীর অনেক অনেক বড়। আর তার পালক সোনালী আলোয় ঝলমল করছে। সে তার ডানার ঝাপটে আগুন নিভিয়ে দিল। হঠাৎ সেখানে বজ্রপাত ও বিদ্যুতের চমক খেলতে লাগল। মুষলধারে বৃষ্টি পড়তে লাগল।

শীঘ্রই আগুন নিভে গেল। বনটা আবার সবুজ হয়ে উঠল। সকল প্রাণী ও পাখীরা আনন্দে হর্ষধ্বনি করে উঠল। আর একটি তরুণ ফিনিক্স পাখী আকাশে উড়ে গেল।





একটি রং-বেরং-এর

হাও তান

ফ্যাং-ফ্যাং ডিম খেতে খুব ভালবাসে।

একদিন তার ঠাকুমা তাকে একটা ছোট্ট মুর্গী কিনে দিলেন। মুর্গীটির সুন্দর ডানা, কালো ল্যাজ, আর মাথায় ঠিক ফ্যাং-ফ্যাং-এর নিজের ছোট চুলের মত একটা ঝুঁটি আছে।

ঠাকুমা ফ্যাং-ফ্যাং-কে এই রং-বেরং-এর মুর্গীটার ভাল মত দেখাশুনা করতে বললেন। তিনি বললেন যে, এই মুর্গীটা ডিম দিতে শুরু করলে তিনি ফ্যাং-ফ্যাং-কে সেই ডিম সেদ্ধ করে খেতে দেবেন।

ফ্যাং-ফ্যাং পরিশ্রমী শিশু। প্রত্যেকদিন সে খুব সকালে উঠে মুর্গীটাকে খাঁচার বাইরে ছেড়ে দেয়।

প্রত্যেকদিন সন্ধ্যায় সে আবার সেটাকে খাঁচায় বন্ধ করে। এবং সে তার মুর্গীটাকে খুব খাওয়ায়।

দিন যায়, ছোট্ট মুর্গীটা বড় হতে থাকে। তার ঝুঁটিটা ক্রমেই লাল থেকে গাঢ়তর লাল হ'তে থাকে,—ঠিক যেন ঠাকুর্দার অল্প-স্বল্প মদ খাওয়া মুখ। ঠাকুমা বলেন, কোন মুর্গীর ঝুঁটি লাল হয়ে উঠলে বুঝতে হবে সেটি ডিম পাড়বার উপযুক্ত হয়েছে।

কিন্তু ফ্যাং-ফ্যাং রোজ রোজ মুর্গীর বাক্সটা দেখে, অথচ সব সময়েই সেটা খালি থাকে। একটা ডিমও দেখা যায় না।

একদিন ফ্যাং-ফ্যাং জিজ্ঞাসা করল: "ঠাকুমা মুর্গীটা এখনও ডিম পাড়ছে না কেন?"

ঠাকুমা উত্তর দিলেন, "ডিম পাড়ত, যদি ও জ্যান্ত খাবার পেত।"

—"তার মানে?"

—"ছোট ছোট কীটপতঙ্গ আর ফড়িং। এগুলোই হ'ল জ্যান্ত খাবার।"

—,,আমি কিছু কিছু ধরে আনব।"

কিন্তু ঠাকুমা বললেন : "ওকে বাইরে ছেড়ে দিলে ও নিজেই ওসব ধরতে পারবে।"

ফ্যাং-ফ্যাংরা গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে থাকে। ওদের বাড়ির সামনে একটা ছোট্ট পাহাড় আছে। সেখানে প্রচুর সবুজ ঘাসের মধ্যে নানা-রং-এর ফুল ফুটে থাকে। পাহাড়ের অপরদিকে যতদূর চোখ যায় শুধু শস্যক্ষেত্র। ওখানে এতবেশী পোকামাকড় লুকিয়ে থাকে যে রং বেরং-এর মুর্গীটি কখনো তা খেয়ে শেষ করতে পারবে না।

ঠাকুমা যা বলেছিলেন ফ্যাং-ফ্যাং তাই করল। সে তার মুর্গীটাকে পাহাড়টির প্রান্তের তৃণভূমিতে চড়াতে নিয়ে গেল। মুর্গীটা কি খুশী! ও যেন একই সঙ্গে একটা চমৎকার নতুন খাবার ঘর আর খেলার মাঠ পেয়ে গেছে! ও সকাল হলেই ছুট্টে বেরিয়ে যায় আর অন্ধকার না হলে ফেরে না।

কিন্তু একদিন মুর্গীটা দুপুরের আগেই ফিরে এসে ওর বাক্সের ঘরে গিয়ে বসে রইল।

ফ্যাং-ফ্যাং এত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল যে মনে হল ওর হৃৎপিণ্ডটাই যেন পুড়ে যাচ্ছে। সে দৌড়ে ঠাকুমার কাছে গিয়ে বলল, "ঠাকুমা মুর্গীটার নিশ্চয়ই অসুখ করেছে।"

ঠাকুমা মুর্গীটার দিকে একনজর চেয়ে হেসে বললেন, "দূর বোকা মেয়ে! ও তো তোর জন্য একটা ডিম পাড়ছে রে!"

ফ্যাং-ফ্যাং তবুও কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়েই রইল। সে একটা টুল নিয়ে এসে মুর্গীর বাক্সের সামনে বসে রইল। রোদ তেতে উঠছে, ফ্যাং-ফ্যাং ঘেমে নেয়ে উঠল। আর ঠিক যখন সে জল খেতে যাবার জন্য বাড়ির ভেতর ঢুকতে যাবে অমনি কোঁকড়-কোঁ শব্দে চমকে উঠল ফ্যাং-ফ্যাং।

রং-বেরং-এর মুর্গীটা লাফিয়ে বাসার থেকে নেমে ডাকতে ডাকতে ফ্যাং-ফ্যাং-এর দিকে ছুটে এল।

এতক্ষণে নিশ্চিত হওয়া গেল, এই তো খড়ের মধ্যে বেশ বড়, সাদা গোল একটা ডিম রয়েছে। ফ্যাং-ফ্যাং ডিমটা তুলে দেখল তখনও বেশ গরম রয়েছে।

এরপর থেকে প্রত্যেকদিন সেই রং-বেরং-এর মুর্গীটা খাবার জোগাড়

করতে বার হত, আর ফিরে এসে ফ্যাং-ফ্যাং-এর জন্য একটা করে ডিম পাড়ত।

একদিন ঠাকুমা একটা সভায় গিয়েছিলেন। তিনি ফিরে এসে ফ্যাং-ফ্যাংকে ডেকে বললেন: "তোকে কয়েকটা কথা বলি, শোন।"

ফ্যাং-ফ্যাং একটা সেদ্ধ ডিম খেতে খেতে ঠাকুমার কাছে দৌড়ে এল।

ঠাকুমা বললেন: "গম কাটার পর আমরা সেই ক্ষেতে ভুট্টা বুনব। আমাদের দলপতি আমাকে একটা কাজ দিয়েছেন। সেটা হল মুর্গীর ছানা আর ভেড়ারা যাতে মাঠে ঢুকে বীজ ও অঙ্কুর খেতে না পারে তা দেখা। আমাদের রং-বেরং-এর মুর্গীটাকেও খাঁচায় আটকে রাখতে হবে রে।"

ফ্যাং-ফ্যাং সপ্রতিভ মেয়ে। সে জানত মুর্গীরা শুধু পোকাই ধরে না, বরং প্রায়ই কচি চারা ঠোকরায় ও মাড়িয়ে যায়। তারাই নতুন বোনা বীজের আর তরতাজা অঙ্কুরিত চারার সবচেয়ে বড় শত্রু। কমিউনের সদস্যদের অবশ্যই নরম ভুট্টার চারাগুলোকে বাঁচাতে হবে কারণ তা সকলের সম্পত্তি। সে তাই সব বুঝে মাথা নাড়ল।

ঠাকুমা ফ্যাং-ফ্যাংকে জিজ্ঞাসা করলেন, "মনে কর্ তোর মুর্গীটা রোজ রোজ ডিম দেওয়া বন্ধ করল, তাও কি তুই মেনে নিবি?"

ফ্যাং-ফ্যাং তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, "হ্যাঁ, তাও মেনে নেব।"

ঠাকুমা খুশী হয়ে বললেন, "এই তো লক্ষ্মী মেয়ের মত কথা। সেই ভাল যে কমিউনকে ভালবাসে। চারাগুলো বড় হলে আবার মুর্গীটাকে বাইরে ছাড়া যাবে।"

আর সেই দিন থেকেই ফ্যাং-ফ্যাং তার মুর্গীটাকে উঠোনের মধ্যেই বন্ধ করে রাখল। কিন্তু রং-বেরং-এর মুর্গীটার এটা একদমই পছন্দ হ'ল না। তাই সে বাইরে যাবার জন্য দারুণ চেঁচামেচি শুরু করে দিল। যখনই ফ্যাং-ফ্যাং বাইরে যাবার জন্য দরজা খোলে তখনি ওটা ফাঁক দিয়ে পালাবার চেষ্টা করে। কিন্তু ফ্যাং-ফ্যাং ওকে হুস্-হুস্ করে তাড়িয়ে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে আঁট করে দরজা বন্ধ করে দেয়। মুর্গীটা প্রতিবাদ ক'রে কোঁকড়-কোঁ ডাক ছাড়ে কিন্তু ফ্যাং-ফ্যাং তাতে কান দেয় না। এইভাবে প্রতিদিন সে তার ঠাকুমাকে নতুন বোনা ফসলের ক্ষেত পাহারা দিতে সাহায্য করে। যখনই কোন মুর্গী—সে যারই হোক না কেন, পাহাড়ের দিকে যেতে চেষ্টা করে ওমনি ফ্যাং-ফ্যাং সেটাকে তাড়িয়ে দেয়।

যখন ঠাকুমা রান্না করতে বাড়ী যান, তখন ফ্যাং-ফ্যাং তার দুই ছোট্ট প্রতিবেশী, সিয়াও-সিং আর উয়ান-উয়ানকে ধানক্ষেতের সীমানা পাহারা দিতে বলে। তিনটি শিশুর মধ্যে একজন পূর্বপ্রান্তে পাহারাদার হয়ে দাঁড়ায় একজন যায় পশ্চিমে। আর অপরজন দাঁড়ায় মাঝপথে। দলছাড়া মুর্গীদের তাড়াবার জন্য চোখ খোলা রেখে ফসলের ক্ষেত পাহারা দেয়, ঠিক যেন গণমুক্তিফৌজের ছোট্ট প্রহরী।

এমনকি যখন প্রজাপতিরা উড়ে বেড়ায়, তখনও তারা তাদের পেছনে ছোটে না।

এমনকি যখন ঘাস ফড়িংরা চারদিকে লাফিয়ে বেড়ায় তখনও তারা তাদের ধরতে ছোটে না।

তারা যে উৎপাদক দলের সম্পত্তি দেখাশুনা করছে। এখন কি করে তারা খেলায় মেতে উঠবে।

কিন্তু একদিন উয়ান উয়ান একটা দুর্ঘটনা ঘটাল।

সেদিন ছিল গ্রীষ্মের সবচেয়ে গরম দুপুর। বড়রা যারা ফসলের ক্ষেতে কাজ করছিল তখনও দুপুরের খাবার খেয়ে ফেরে নি। গ্রামের রাস্তাটা ফাঁকাই ছিল ; ক্ষেতের প্রান্তে ঐ তিনটি শিশুকে ছাড়া আর কাউকে দেখা যাচ্ছিল না। হঠাৎ একঝাঁক মুর্গী একটা বড় পোষা মোরগের নেতৃত্বে পাহাড়টার দু'দিক থেকে উঠে এল।

উয়ান-উয়ান ক্ষেতের পশ্চিম ধারে গ্রামের পথের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে উইলো গাছের পাতা দিয়ে একটা রোদ আটকানোর হেলমেট বানাচ্ছিল। সে মুর্গীগুলোকে দেখতেই পায়নি মোটে।

মুর্গীগুলো পাহাড় থেকে ফিরে এসে ঝাঁক বেঁধে ক্ষেতের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। তারপর তারা ফসল ঠোকরাতে শুরু করল। কয়েকদিন আগে যে বীজ বোনা হয়েছে তাদের অঙ্কুর বেরোতে শুরু করেছে। বাচ্চা মুর্গীগুলো নখ দিয়ে সেগুলো আঁচড়িয়ে বার করে খেতে লাগল।

ফ্যাং-ফ্যাং মাঝমাঠে দাঁড়িয়েছিল বলে এটা দেখতে পেল আর উয়ান-উয়ানকে চেঁচিয়ে বলল : "এই! ঐ দেখ্ মুর্গী!"

ঘাড় ঘুরিয়ে দেখেই উয়ান-উয়ান চমকে উঠল। সে তৎক্ষণাৎ নিজের উইলো পাতার হেলমেট দিয়ে ওদের তাড়াতে আরম্ভ করল।

কিন্তু মুর্গীগুলো সত্যিই শয়তান। উয়ান-উয়ান যতই ওদের তাড়াতে

চেষ্টা করে, ততই তারা সারা ক্ষেতটায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে দৌড়তে থাকে। উয়ান-উয়ান এতই উত্তেজিত হয়ে পড়ে যে সে একটা বড় পাথর তুলে নেয় মুর্গীগুলোকে মারবে বলে।

ফ্যাং-ফ্যাং তাকে দেখে চীৎকার করে বলল, "উয়ান-উয়ান, পাথর ছুঁড়িস না। বরং ওদের তাড়িয়ে দে।"

কিন্তু ফ্যাং-ফ্যাং-এর মুখ থেকে কথা বেরোবার আগেই উয়ান-উয়ান পাথরটা ছুঁড়ে দিয়েছে। পাথরটা সেই ঝাঁকের মধ্যেকার একটা রং-বেরং-এর মুর্গীর পিঠে গিয়ে আঘাত করল।

মুর্গীটা একবার কোঁকর-কোঁ করে উঠে মাটিতে পড়ে গেল। বাদ বাকী মুর্গীরা কিচির-মিচির করতে করতে নানাদিকে ছড়িয়ে গেল।

তিন ছোট্ট বন্ধু দৌড়ে আহত মুর্গীটাকে দেখতে গেল। ওরা বুঝতে পারল না কোথায় ওর লেগেছে। কিন্তু মুর্গীটাকে মৃতপ্রায় মনে হচ্ছিল, কারণ ওর চোখদুটো বন্ধ হয়ে আছে আর শ্বাস নেবার জন্য হাঁফাচ্ছে।

উয়ান-উয়ান হাততালি দিয়ে বলে উঠল, "দেখ্! আমার টিপ্ কি চমৎকার!"

ফ্যাং-ফ্যাং উয়ান-উয়ানের পিছনে এসে বলল: "তুই এত বক্‌বক্ করছিস্ কেন? মুর্গীটা মরে যাচ্ছে।"

"ঠিকই হয়েছে! কে ওকে আমাদের উৎপাদক দলের ফসল নষ্ট করতে বলেছে!" উয়ান-উয়ান উত্তর দিল।

ফ্যাং-ফ্যাং বলল, "কি করে একটা মুর্গী এতসব বুঝবে? আমাদের দলপতি আমাদের ক্ষেতটা পাহারা দিতে বলেছিলেন। তিনি তো আমাদের পাথর ছুঁড়ে মুর্গী মারতে বলেন নি। যা হোক এই মুর্গীটা কাদের?"

সিয়াও-সিং জবাব দিল, "এটা ওয়াং ঠাকুর্দার।"

উয়ান-উয়ান তখন ভাল ভাবে দেখল। সত্যিই তো এটা ওয়াং ঠাকুর্দার। ওয়াং ঠাকুর্দা গণমুক্তি ফৌজের একজন সৈনিকের বাবা এবং উয়ান-উয়ানের বাবা মা প্রায়ই বলেন যে তিনি তাঁর এক ছেলেকে দেশের সীমান্ত রক্ষার কাজে পাঠিয়েছেন। সুতরাং আমাদের সবার তাঁকে শ্রদ্ধা করা উচিত এবং তাঁকে সব রকমভাবে আমাদের সাহায্য করা উচিত। এখন তো ওয়াং ঠাকুর্দার রং-বেরং-এর মুর্গীটাই মরার মত পড়ে আছে। কিভাবে ওরা এর ক্ষতিপূরণ করবে?

উয়ান-উয়ান কান্না জুড়ে দিল। সে সব দোষ ফ্যাং-ফ্যাং-এর ওপর

চাপাল। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, "সব দোষ তোর। তুই-ই তো আমাকে ক্ষেত পাহারা দিতে বলেছিলি।"

ফ্যাং-ফ্যাং উত্তর দিল: "আমরা সবাই কমিউন সদস্য তাই আমাদের উচিত সব সময় উৎপাদক দলের জন্য ভাল কাজ করা। যাই হোক আমি তো তোকে মুর্গীগুলোর দিকে পাথর ছুঁড়তে বলিনি।"

উয়ান-উয়ান আরও জোরে কাঁদতে লাগল।

ফ্যাং-ফ্যাং মাথা নীচু করে এক মুহূর্ত কি ভাবল আর তারপর বলল: "কাঁদিস না উয়ান। আমি একটা উপায় বার করেছি। আমি না ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা কর।"

এই বলে, ফ্যাং-ফ্যাং দৌড়ে বাড়ী গেল আর তার নিজের রং-বেরং-এর মুর্গীটাকে খুঁজতে লাগল।

সেটা তখন ওর বাক্সের ওপর বসে; এখুনি ডিম পাড়বে।

ঠাকুমা রান্না করতে করতে দেখলেন ফ্যাং-ফ্যাং মুর্গীটাকে বাক্স থেকে তুলে নিতে যাচ্ছে। "হ্যাঁরে তুই ওটাকে তুলছিস কেন? দেখছিস না ওটা ডিম পাড়ছে?"—ঠাকুমা প্রশ্ন করলেন।

ফ্যাং-ফ্যাং বুঝিয়ে বলল, "ওয়াং ঠাকুর্দার গায়ে ছোপ ছোপ মুর্গীটা না চারাগাছ খেতে ক্ষেতের ভিতর ঢুকে ছিল। আর আমরা......আমরা ওটাকে একটা পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলেছি...... ।"

ঠাকুমা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: "তুই মেরেছিস নাকি?"

ফ্যাং-ফ্যাং চুপ করে রইল, কোন উত্তর দিল না।

ঠাকুমা খুব অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন: "বোকা মেয়ে! কেন ওটাকে তাড়িয়ে দিতে পারলি নে?"

"আমি ওয়াং ঠাকুর্দাকে আমার নিজের মুর্গীটা দিয়ে দেব।"

"তুই আর ডিম খাবি না?"

ফ্যাং-ফ্যাং মাথা নাড়ল।

ঠাকুমা বললেন: "তুই ঠিকই বলেছিস। এটাই ঠিক কথা।"

ঠিক দরজার সামনেই ফ্যাং-ফ্যাং-এর সংগে ওয়াং ঠাকুর্দা আর উয়ান-উয়ানের দেখা হল। উয়ান-উয়ানের হাতেও একটা মুর্গী। দেখে মনে হচ্ছে সে ওয়াং ঠাকুর্দার সংগে আসতে চাইছিল না।

"ওয়াং ঠাকুর্দা, উয়ান-উয়ানকে যেতে দাও। এটা আমারই দোষ।

আমিই তোমার মুর্গীকে মেরেছি। আমি তোমাকে একটা মুর্গী দিচ্ছি।" —ফ্যাং-ফ্যাং বুড়ো মানুষটির কাছে দৌড়ে গিয়ে এই কথা বলে মুর্গীটাকে তাঁর কোটের পকেটে ঢুকিয়ে দিল।

ওয়াং ঠাকুর্দ্দা হেসে উঠলেন।

ফ্যাং-ফ্যাং আর তার ঠাকুমা, যিনি শব্দ শুনে দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, কেউই বুঝতে পারল না কেন ওয়াং ঠাকুর্দ্দা হেসে উঠলেন।

ঠাকুমা বৃদ্ধের কাছে ক্ষমা চাইতে শুরু করলেন, "আমাদের ফ্যাং-ফ্যাং সত্যিই খুব বোকামী করেছে··· ।"

ওয়াং ঠাকুর্দ্দা বাধা দিয়ে বললেন, "ওকে দোষ দিও না মাসী ও ঐ পাথরটা ছোঁড়ে নি।"

উয়ান-উয়ান বলে উঠল, "পাথরটা আমি ছুঁড়েছি।"

ওয়াং ঠাকুর্দ্দা বুঝিয়ে বললেন, "উয়ান উয়ানও তার নিজের মুর্গীটা নিয়ে এসেছে আমায় শোধ দেবে বলে।"

তখনই ফ্যাং-ফ্যাং বুঝল যে উয়ান-উয়ানের কোলের মুর্গীটা হল ওর সবচেয়ে ভালো ডিম দেওয়া মুর্গী। সে তখন অনুরোধ করতে লাগল। "ওয়াং ঠাকুর্দ্দা, আমারই উচিত তোমারটা শোধ করা। আমারটা নাও না।"

উয়ান-উয়ান চীৎকার করে বলল, "না আমারই শোধ করা উচিত, ঠাকুর্দ্দা আমারটা নাও।"

ঠাকুর্দ্দা হাসতে হাসতে বললেন, "ওরে, তোরা ঝগড়া করিস না। তোদের কারোরই শোধ দেবার দরকার নেই। এটা ঠিক, আমার মুর্গীটার লেগেছে। কিন্তু ওটা না-ও মরতে পারে। আর যদি মরেই, তোদের ঠাকুর্দ্দা তোদের তা শোধ করতে দেবে না। তোরা উৎপাদক দলের শস্য পাহারা দিচ্ছিলি, তোরা মুর্গী যাতে শস্য নষ্ট না করে তা দেখছিলি, তোরা তো ঠিক কাজই করেছিস।"

মাথা নাড়তে নাড়তে উয়ান-উয়ান বলল, "ওটা আমারই দোষ।"

ফ্যাং-ফ্যাং বলল, "না আমিই দোষ করেছি।"

ওয়াং ঠাকুর্দ্দা বললেন, "তোদের কারোরই দোষ নয়। দোষটা আমারই। আমিই আমার মুর্গী ঠিকমত সামলে রাখিনি। তাই খুবই স্বাভাবিক যে ওটা ক্ষেতে ঢুকবে। ঠাকুর্দ্দা তোদের প্রত্যেককে একটা করে বাঁশের লাঠি দেবে।

এখন থেকে তোরা ওগুলো দিয়ে মুর্গী তাড়াতে পারবি। আর পাথর টাথর ছুঁড়িস না।"

হাসতে হাসতে ঠাকুমা ওয়াং ঠাকুর্দাকে বললেন, "ওরা আপনার মুর্গীকে মারল আর আপনি ওদের পুরস্কার দিচ্ছেন?"

কিন্তু ওয়াং ঠাকুর্দা উত্তর দিলেন, "আমি কিন্তু ওদের পুরস্কার দিচ্ছি ওরা ভাল তাই। মুর্গীদের পাথর ছোঁড়ার জন্য নয়।"

ফ্যাং-ফ্যাং আর উয়ান-উয়ান চোখে চোখে তাকিয়ে খুশীর হাসিতে ফেটে পড়ল।





মাছ ধরার গল্প

তু-া

সেটা ছিল কোন এক রবিবারের ভোরবেলা। টাং-টিং..লেকের জলের ছোট ছোট ঢেউ-এর ওপর সূর্য্যের আলো পড়ে চিক্‌চিক্ করছে। সিয়াও লিং নামে এক ক্ষুদে লালরক্ষী আর তার ছোটভাই সিয়াও লুং একটা ছোট নৌকার দাঁড় বেয়ে সেই লেকে গেল।

এই সময়টা মাছ ধরার পক্ষে সবচেয়ে ভাল। তাদের বাবা অন্য জেলেদের সংগে ভোরের আগেই লেকে গেছেন নৌকা নিয়ে। যাওয়ার আগে তিনি সিয়াও লিং আর সিয়াও লুংকে লেকে গিয়ে তাদের উৎপাদক দল যেখানে মাছ ধরার জন্য বঁড়শি পেতে রেখেছে—সে জায়গাটা দেখে আসতে বলে গিয়েছিলেন।

সূর্য্যের আলোয় লেকের জল ভারী সুন্দর ঝিক্‌মিক্ করছে। রূপালী রং-এর গাং-চিলগুলো নীল জলের ওপর দিয়ে জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। বকগুলো তাদের লম্বা গলা বাড়িয়ে জল থেকে খাবার সংগ্রহ করছে। সিয়াও লিং দাঁড় বাইতে লাগল আর সিয়াও লুং বঁড়শিগুলোর দিকে লক্ষ্য রাখছিল। ভাইবোনে একসংগে মনের আনন্দে গান গেয়ে উঠল।

হঠাৎ জলে একটা ঘূর্ণি আরম্ভ হল আর তাদের ছোট্ট নৌকাটা প্রচণ্ডভাবে দুলতে লাগল। একটা প্রকাণ্ড স্টার্জন মাছ জলের ওপরে ভেসে উঠল, তার পিঠ রোদে চক্‌চক্ করতে লাগল।

"কি বিরাট স্টার্জন মাছ!" সিয়াও লুং বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল। "এটার ওজন বেশ কয়েক'শ পাউণ্ড হবে!" মাছটা বঁড়শিতে গেঁথে গেছে আর ঝটকা মারছে নিজেকে মুক্ত করার জন্য। সিয়াও লিং চীৎকার করে বলল, "সুতোটা আলগা কর সিয়াও লুং, শিগ্‌গির!"

সিয়াও লুং মাছটা যে সুতোয় আটকা পড়েছিল, সেটাকে তাড়াতাড়ি ঢিলে করে দিল। কিন্তু মাছটা জলের মধ্যে একটা আবর্ত সৃষ্টি করেই ডুব দিল জলের তলায়।

খুব বরাতজোর যে সিয়াও লুং ঠিক সময়ে সুতোটা ছেড়ে দিয়েছিল, না হলে তাদের নৌকাটাই উল্টে যেত। এখন মাছটা যাতে ব্রিগেডের পেতে রাখা সব বঁড়শিগুলো নিয়ে পালাতে না পারে সেটাই ওদের দেখতে হবে।

সিয়াও লিং-এর মনে পড়ল ব্রিগেড পার্টি সম্পাদক চ্যাং খুড়োর সেই কথাগুলো, "আমরা মাছ ধরি বিপ্লবের স্বার্থে।" তার বাবাও বলেছিলেন, "মাছ ধরার বঁড়শিগুলো সযত্নে রাখবে, ওগুলো যৌথ সম্পত্তি।" তাই সে তার ভাইকে বলল যে তাদের ঐ বঁড়শিগুলো যাতে খোয়া না যায় তা দেখতেই হবে। আর ঐ বিরাট স্টার্জন মাছটাকেও ধরতে হবে।

সিয়াও লিং সেই মাছ ধরার শক্ত সুতোটা বাঁশের খুঁটি থেকে খুলে নিল, যাতে মাছটা খুঁটিটা ভেঙ্গে ফেলতে না পারে। তারপর সে একটা ফাৎনা দিয়ে রাখল সুতোটার ওপর যাতে মাছের গতিপথের একটা হদিশ মেলে।

স্টার্জনটা জোরে ছুটতে লাগল, ফাৎনাটা রইল তার পিছনে পিছনে। ভাই-বোন দুজনে মিলে মাছটার পিছনে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দাঁড় বেয়ে যেতে লাগল।

মাছটা ক্লান্ত হয়ে জলের ওপর ভেসে উঠল, ফলে সিয়াও লিং আর সিয়াও লুং মাছটাকে অনুসরণ করে অগভীর জলের দিকে সাবধানে নিয়ে যাবার সুযোগ পেয়ে গেল।

কিন্তু হঠাৎ মাছটা ঘুরে লেকের গভীর জলের দিকে চলে গেল। সিয়াও লিং তৎপরতার সংগে সুতোটা ছেড়ে দিয়ে ফাৎনাটা দেখে সেটার পিছু নিল।

যখন মাছটা আবার ক্লান্ত হয়ে পড়ল, তখন ওরা চেষ্টা করল মাছটাকে তীরে নিয়ে যাবার। কিন্তু মাছটা আপ্রাণ লড়াই করতে লাগল এবং ওরাও ঘন্টার পর ঘন্টা চেষ্টা করতে লাগল ও লেকের মধ্যে অনেক দূর চলে গেল।

ক্লান্ত আর ক্ষুধার্ত সিয়াও লিং সিয়াও লুংকে জিজ্ঞাসা করল যে সে খুব পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে কিনা। কিন্তু সিয়াও লুং দৃঢ়ভাবে বলল, "না, চল, আবার চেষ্টা করি, মাছটাকে নিশ্চয়ই ধরতে পারব আমরা।"

"ঠিক বলেছ," সিয়াও লিং সোৎসাহে বলল, "আমরা বিপ্লবের স্বার্থে মাছ ধরি। আমাদের ভয় পাবার কিছুই নেই।"

তখন বঁড়শিতে গাঁথা স্টার্জন মাছটা ছাড়া পাবার জন্য মরীয়া হয়ে চেষ্টা করছে, জলে তরঙ্গ সৃষ্টি করছে আর নৌকাটা জলের ওপর দুলছে।

যদিও ভাইবোন দুজনে লেকের ধারেই বড় হয়ে উঠেছে, তবুও এরকম অভিজ্ঞতা তাদের এই প্রথম। সিয়াও লুং টাল সামলাতে না পেরে নৌকা থেকে জলে পড়ে গেল।

আর তখনই মাছটা মরীয়া হয়ে সামনের দিকে এগোতে লাগল। সিয়াও লুং জল থেকেই তার বোনকে চেঁচিয়ে বলল, "মাছটাকে পালাতে দিও না।" সিয়াও লিং হাত বাড়িয়ে তার ভাইকে ধরে নৌকায় টেনে তুলল। ফাৎনাটা তৎক্ষণে অনেক দূরে চলে গেছে। মাছটা কোথায় গেল তা খুঁজে বার করার জন্য ওরা জলের ঢেউ অনুসরণ করে করে এগোতে লাগল।

কিন্তু তারা মাছের দেখা পাবার আগেই মাছটার গতিপথের চিহ্ন আর ঐ ফাৎনাটা দুটোই অদৃশ্য হয়ে গেল। এখন এই এতবড় লেকের মধ্যে ঐটুকু একটা ফাৎনা কি করে খুঁজে বার করবে ওরা!"

গাংচিলগুলো জলের ওপরে একজায়গায় চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে ওদের জানিয়ে দিচ্ছিল যে সেখানে মাছ আছে।

হঠাৎ সূর্য্যের একটা তির্যক আলোর রশ্মিতে ভাইবোন দেখতে পেল যে এক জায়গায় জলের মধ্যে আলোড়ন হচ্ছে। ওরা তাড়াতাড়ি সেই জায়গাটায় গেল। একটা ঘূর্ণির মধ্যে ফাৎনাটা দেখতে পেয়ে ওরা চেঁচিয়ে উঠল, "ঐ তো মাছটা ওখানে!"

যত চেষ্টাই করুক না কেন, মাছটা বঁড়শি থেকে নিজেকে ছাড়াতে পারল না, শুধু নিজে ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ল। সিয়াও লিং আর সিয়াও লুং আর দেরী না করে মাছটাকে টেনে আনল।

শেষ পর্যন্ত যখন মাছটাকে অগভীর জলে টেনে আনা হল, ছেলেমেয়ে দুটি আনন্দে চীৎকার করে উঠল, "দ্যাখো, মাছটা কত বড়!"

খুবই ক্লান্ত হয়ে ভাইবোন দুজনেই মনে মনে চাইছিল যেন তাদের সাহায্য করতে বাবা ও চ্যাং খুড়ো এসে পড়েন।

কিন্তু যদি স্টার্জনটা আবার পালায়। চেয়ারম্যান মাও যে বলেছিলেন, "দৃঢ় সংকল্প হও। কোন ত্যাগস্বীকারে ভীত হয়ো না এবং সকল বাধা অতিক্রম করে চূড়ান্ত জয়ের লক্ষ্যে এগিয়ে যাও," সেই কথাগুলি মনে রেখে

সিয়াও লিং ও সিয়াও লুং ঠিক করল যে ওরা নিজেরাই মাছটাকে তীরে নিয়ে যাবে।

কাজটা ওদের তাড়াতাড়ি করতে হবে, কারণ রাত্রির অন্ধকারে তাদের কাজ আরো কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। সিয়াও লিং বাঁশের খুঁটি দিয়ে মাছটাকে জোরে একটা খোঁচা দিল।

হঠাৎ খোঁচা খেয়ে স্টার্জনটা তীরের দিকে এগোতে লাগল, তারপর অকস্মাৎ নৌকাটায় একটা জোর ধাক্কা মারল। ফলে ওরা দুজনেই নৌকা থেকে ছিট্‌কে পড়ল।

ক্লান্ত আর ক্ষুধার্ত হলেও সিয়াও লুং, সিয়াও লিং-এর দেখাদেখি মাছটাকে তাড়িয়ে নিয়ে যেতে লাগল, মাছটা দাপাদাপি করে ঐ অগভীর জল ঘোলা করে দিল।

শেষে মাছটা যখন নিশ্চল হয়ে পড়ে রইল তখন গোধূলির সময়। যখন সিয়াও লিং তার ভাইয়ের মুখ থেকে ঘাস আর কাদা মুছে দিল, সে আনন্দে বলে উঠল, “বাবা আর চ্যাং খুড়ো খুব খুশী হবেন আমরা এই বিরাট মাছটাকে তীরে নিয়ে আসতে পেরেছি বলে।”

তখন আকাশে থালার মত চাঁদ উঠেছে। ছেলেমেয়ে দুটির বাবা ও অন্য জেলেরা ওদের খোঁজাখুঁজি করছিলেন আর তাদের নাম ধরে ডাকছিলেন। তাদের বাবা শট্‌গান থেকে শূন্যে গুলি ছুঁড়লেন।

ভাইবোন উল্লসিত হয়ে বলে উঠল, “নিশ্চয়ই বাবা আসছেন।” তারা দুজনে চিৎকার করে হাত নাড়তে লাগল। তাদের বাবা এবং অন্যরাও ওদের হাত নাড়তে আর চিৎকার করতে দেখলেন।

একটি স্টীম লঞ্চে চ্যাং খুড়ো এসে পড়লেন। দুটি ছোট ছেলেমেয়ে কেমন করে ঐ প্রকাণ্ড স্টার্জন মাছটাকে তুলে এনেছে সেই ঘটনার কথা শুনে সব জেলেরা ঐ বাচ্চাগুটির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন।

আনন্দ কোলাহল আর উল্লাসের হাসির মধ্যে লঞ্চটি নৌকাগুলিকে আর সেই বিরাট বিজয় উপহার—সেই দৈত্যাকার স্টার্জন মাছটাকে নিয়ে ঘরে ফিরে এল



সাগর কুসুম

ইউ সুং-ইয়েন

একদিন খুব ভোরবেলা সাগর পারের সাওশি গ্রামের উৎপাদক দলের নগররক্ষী বাহিনী কুচকাওয়াজ করছিল। হঠাৎ সেখানে পেছন দিকের ঝোপ থেকে লাল ফিতে বাঁধা একটা বর্শা এসে পড়ল। সেটা হল রেড ষ্টার প্রাইমারী স্কুলের ছোট্ট লালরক্ষী সাগর কুসুমের বর্শা—সে সেই বাহিনার প্রতিটি অঙ্গভঙ্গীই অনুকরণ করছিল। তার কি ভীষণ ইচ্ছেই না ছিল কোন একদিন এই নগররক্ষী বাহিনীর "কাকুদের" মতো সেও তার দেশের সাগর তীরের প্রতিরক্ষা করার জন্য রক্ষী ও পাহারাদারের কাজ করবে!

আর এখন সাগর কুসুমের স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হল। শীতের ছুটির শুরুতে উৎপাদক দলের পার্টি শাখার সম্পাদক লি কাকার অধীনে একটি ছোটদের লালরক্ষী প্রহরাদার বাহিনী গড়ে তোলা হল। তার দলনেতা হল সাগর কুসুম। দল নেত্রী সাগর কুসুম ছোট্ট লালরক্ষীদের বেয়নেট নিয়ে কুচকাওয়াজে নির্দেশ দিতে লাগল।

একদিন লি কাকা ছোটদের লালরক্ষী বাহিনীকে গ্রামের শেষে হাতির শূঁড় পাহাড়ের দিকে নিয়ে গেলেন। নীড়ভরা চড়ুইপাখীর মতো খুশীতে ডগমগ হয়ে শিশুরা ছুটতে ও গান গাইতে আরম্ভ করল—লি কাকার মনে হ'ল অতীতের অবস্থা থেকে এ একেবারে ভিন্ন পরিবেশ।

লি কাকা ছেলেমেয়েদের অতীত দিনগুলো সম্বন্ধে বললেন। "অতীতের সেই ভয়ংকর সমাজে ছোট বড় মাছ ব্যবসায়ীরা জেলেদের উপর খুব অত্যাচার করত। ঠিক এই হাতীর শূঁড় পাহাড়েই একজন বড় সাওসি মাছ ব্যবসায়ী প্রতিক্রিয়াশীল সরকারকে দিয়ে জেলেদের হত্যা করিয়েছিল কারণ তারা

অত্যধিক খাজনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন……।" এই ইতিহাস শুনে শ্রেণী শত্রুর বিরুদ্ধে শিশুদের ক্রোধ জাগ্রত হ'ল।

লি কাকা গম্ভীরভাবে ছোটদের লালরক্ষী বাহিনীকে একটা শঙ্খ দিলেন। জোর করে খাজনা আদায়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সময় এই শঙ্খটি ব্যবহার করা হত। ছোটদের লালরক্ষী বাহিনীর হাত থেকে শঙ্খটা নিয়ে শিয়াও-পো ভীষণ অভিভূত হয়ে পড়ল। সে শ্রেণী-শত্রুদের বিরুদ্ধে তাদের পূর্বপুরুষদের সংগ্রামের বৈপ্লবিক উদ্দীপনা থেকে শিক্ষা নেবার শপথ গ্রহণ করল।

প্রতিদিন ভোরবেলা নিঃশব্দ সাগরতীরে ছোট ছোট পদধ্বনি শোনা যায়। ছোটদের লালরক্ষী বাহিনীর প্রহরা শুরু হয়েছে। দুষ্টু লোকেরা রাতে এসে চলে যেতে পারে ও কোন প্রমাণ রেখে যেতে পারে, এই ধারণা থেকে ছেলে-মেয়েরা প্রতি সকালে ঝড়বৃষ্টি উপেক্ষা করে সাগর তীরে পালা করে পাহারা দিতে লাগল।

শ্রেণী শত্রুরা ছোটদের লালরক্ষী বাহিনীর এই পাহারা দেওয়াতে খুব ভয় পেয়ে গেল। একদিন সিয়াও-পো ঠিক করল সে আরও কিছু বর্শার হাতল জোগাড় করবে। তাই সে বনের দিকে যাচ্ছিল। হঠাৎ সে গ্রামের মাছ ব্যবসায়ীর বউকে দেখতে পেল বন থেকে জ্বালানী কাঠ কেটে ফিরছে। সিয়াও-পো তার কাঠের বাণ্ডেলের মধ্যে একটা লাল ছালসহ শক্ত গাছের ডালের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। জেলেবউটি কলকলিয়ে বলে উঠল: "তোমার এই ডালটা খুব পছন্দ হয়েছে? আমি তোমাকে এটা দেব।"

"দূর তোমার জিনিষ কে চায়?" এই কথা বলে সিয়াও-পো নিজের পথে চলতে লাগল। জেলেবউ চোখ দুটো বন্ধ করে একটা পরিকল্পনা করল। "এই রাস্তা দিয়ে চলে যাও। কিছুদূর গেলে একটা উপত্যকা পাবে। উপত্যকার ঢালে একটা ভেঙে পড়া পাইন গাছ আছে, আর সেখানেই অনেক লাল ছাল সহ গাছের ডাল দেখতে পাবে।" সে পেছন থেকে চিৎকার করে সিয়াও-পোকে কথাগুলো বলল।

আধা সন্দেহ, আধা বিশ্বাস নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সিয়াও-পো সত্যিই একটা ভেঙে পড়া পাইন গাছ পেল। কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজি করেও সে কোন লাল ছালসহ গাছের ডাল দেখতে পেল না এবং বুঝতে পারল যে মাছ ব্যবসায়ীর বউ তাকে মিথ্যা কথা বলেছে। আর তখন তাড়াহুড়ো করে বর্শার

জন্য অন্যান্য ডাল কাটতে গিয়ে তার গলায় ঝোলানো শঙ্খটার দড়ি ঢিলে হয়ে গিয়ে নীচে উপত্যকায় পড়ে গেল। কিন্তু সিয়াও-পো তা জানতে পারল না।

এদিকে সাগর কুসুম ও চি-হাই গ্রামে সিয়াও-পোকে খোঁজাখুজি করছিল। তাকে সেখানে না পেয়ে তার নাম ধরে ডাকতে ডাকতে তারা পাহাড়ের কাছে এসে হাজির হল। তারা পাহাড়ের নীচে ভোঁদর গুহার কাছে গিয়েই সিয়াও-পোর প্রত্যুত্তর পেল।

সাগর কুসুম শংকিত হয়ে পড়ল। বড়রাও একা ভোঁদর গুহার কাছে যেতে সাহস করে না। সিয়াও-পো যদি ওখানে গিয়ে থাকে তবে ওর কি বিপদই হতে পারে! সে ছুটে ঢালু জমি দিয়ে নেমে গেল এবং সিয়াও-পোকে একটা ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখল।

কি হয়েছে জিজ্ঞেস করতে গিয়ে সাগর কুসুম লক্ষ্য করল যে সিয়াও-পোর গলায় শঙ্খটা নেই। ওরা তিনজনেই খুব উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল, কারণ ওদের মনে পড়ল লি কাকা প্রায়ই বলতেন, "শঙ্খ হচ্ছে রণশিঙ্গা বাদকের অস্ত্র, এইটাকে সবসময় সাবধানে রাখতে হবে, যত্ন নিতে হবে।" তিনজনে মিলে বিষয়টা নিয়ে সামান্য পরামর্শ করে নিল; তারপর তারা ভিন্ন ভিন্ন পথে সেটা খুঁজে বার করার সিদ্ধান্ত নিল।

সাগর কুসুম উঁচু নীচু সব জায়গায় দেখল এবং অবশেষে সেই ভেঙে পড়া পাইন গাছটার কাছে এল। সে নীচের উপত্যকার দিকে তাকাল। ওঃ, ওখানে কাদার মধ্যে শঙ্খটা পড়ে আছে! সে নীচে নেমে গেল, সেখানে গিয়ে যেই সে শঙ্খটা তুলতে গেল অমনি মুখে কাঁকড়া নিয়ে একটা বেড়ালের মতো প্রাণী তার দিকে ছুটে এল।

চমকে উঠল সাগর কুসুম, সেটাকে ভাল করে লক্ষ্য করল। ওটা একটা ভোঁদর। তারপর চোখের নিমেষে প্রায় এক ডজন ভোঁদর এসে কাঁকড়ার গর্তগুলো ঘিরে ফেলল। সে চুপি চুপি তার লাল ফিতে বাঁধা বর্শাটাকে শঙ্খটার দিকে বাড়াল। আর যেই না সে শঙ্খটাকে তুলতে যাবে একটি ভোঁদর তাকে দেখে ফেলল।

অদ্ভুতভাবে চিৎকার করতে করতে ভোঁদরগুলো সাগর কুসুমকে আক্রমণ করল। সে ভয় পেল না বরং তার লাল ফিতে বাঁধা বর্শা দিয়ে আত্মরক্ষা করতে লাগল, অবশ্য ভোঁদরের লোম ও চামড়া খুব মসৃণ ও শক্ত। কাঠের বর্শা দিয়ে ওদের ঘায়েল করা কঠিন।

অবশেষে সিয়াও-পো ও চি-হাই সেখানে এসে হাজির হল এবং তারা যখন দেখল যে সাগর কুসুম উপত্যকায় ভোঁদরদের সাথে লড়াই করছে, তারাও ঢাল বেয়ে ছুটে এল তাকে সাহায্য করার জন্য। সাগর কুসুম তার বর্শা দিয়ে একটাকে চিৎ করে ফেলল, আর চি-হাই তার তলোয়ার দিয়ে আর একটাকে মেরে ফেলল।

এই সংকটের মধ্যে খুব তাড়াতাড়ি চিন্তা করে সাগর কুসুম শঙ্খটাকে তুলে নিল এবং সেটায় খুব জোরে ফুঁ দিল। আর সেই শংখের ডাক উপত্যকায় ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হল, এবং ভোঁদরেরা সব ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল।

লি কাকা ছেলেমেয়েদের খোঁজাখুঁজি করছিলেন। তিনি শংখের ডাক শুনে সোজা উপত্যকায় চলে এলেন। সিয়াও-পো যখন তাকে বলল কিভাবে মাছ ব্যবসায়ীর বউ তাদের এই বিপথে ঠেলে দিয়েছে, লি কাকা তাদের সাবধান করে দিয়ে বললেন: "ঐ বেইমান শয়তানী এখনও ঠাণ্ডা হয়নি। আজ তোমরা কামড় খেতে খেতে বেঁচে গেছ। পরের বার সাবধান হয়ো!"

ভোঁদর গুহার শিক্ষা তাদের সজাগ দৃষ্টিকে আরও তীক্ষ্ণ করে তুলল। তাই একদিন খুব ভোরবেলা ঘুরে ঘুরে পাহারা দেবার সময় সাগর কুসুম ও জুই-চুয়ান যখন হাতির শুঁড় পাহাড়ের পাদদেশে একটা রবারের জুতো দেখতে পেল, তারা অবাক হয়ে ভাবল কিভাবে ওটা ওখানে গেল।

সাগর কুসুম জুতোটা নিয়ে ফিরে এসে লি কাকাকে সব কথা বলল। তিনি সেটাকে পরীক্ষা করে বললেন: "একজন কমিউন সদস্য এইমাত্র জানিয়ে গেল যে গত রাতে সমুদ্রতীরে কে যেন সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করছিল। যেভাবে সে হাঁটছিল তাদের মনে হয়েছে যে সে মাছ ব্যবসায়ীর বউ হতে পারে। হয়ত এই জুতোটাও তার। আমাদের চোখ খোলা রাখতে হবে!"

একদিন বিকেলবেলা একজন অচেনা ফেরিওয়ালা বাঁকে করে ঝুড়ি নিয়ে গ্রামে এলো। গ্রামের মধ্য দিয়ে এক চক্কর মেরে সে শেষে মাছ ব্যবসায়ীর দরজায় গিয়ে হাজির হল। মাছ ব্যবসায়ীর বউয়ের সাথে কিছু আকার ইঙ্গিত বিনিময়ের পর সে তার কাছ থেকে একটা পুরণো রবারের বুট জুতো কিনল। আর এই সব কিছুই দেখে ফেলল সেই ছোটদের লাল রক্ষীরা যারা তার উপর নজর রাখছিল।

সেই ফেরিওয়ালা গ্রাম থেকে চলে যাবার মুহূর্তে সিয়াও পো ও চি-হাই

তাকে আটকাল এবং তার কাছে বিক্রির তালিকা দেখতে চেয়ে তাকে উৎপাদক দলের অফিসে নিয়ে গেল। লোকটাকে বলা হল, তার ঝুড়িগুলো নীচে রেখে ওপরে দলনেতার সাথে দেখা করতে। লোকটা অবশ্য ঝুড়িদুটো তার সাথে উপরে নিয়ে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল।

সাগর কুসুম ওপর থেকে সবই শুনতে পেল এবং সে একটি নাদুসনুদুস ছেলেকে নীচে যেতে বলল। সরু সিঁড়ি বেয়ে ছেলেটা দ্রুত নেমে আসতে গিয়ে ফেরিওয়ালার ঘাড়ের উপর পড়ল এবং তার ঝুড়িগুলো উল্টে গেল। ভেতরের জিনিসপত্তর সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল।

সরু সিঁড়ি দিয়ে ঝুড়িগুলো উপরে নিয়ে যাবার জন্য চেষ্টা করায় চি-হাই সেই অচেনা লোকটাকে খুব ধমক দিল। লোকটা জিনিস-পত্তরগুলোকে তুলে নিল এবং ঘরে যেহেতু দুটো বাচ্চা ছেলে মাত্র রয়েছে, সে ঝুড়িগুলো ওখানেই রেখে উপরে যাওয়া নিরাপদ বোধ করল। সিয়াও-পো অচিরেই ঝুড়ির ভেতরে তিনটে রবারের বুট জুতো খুঁজে পেল এবং পাশের ঘরে বসা লি কাকাকে সেগুলো দেখালো।

লি কাকা জুতোগুলোর মধ্যে থেকে সাগর কুসুম সমুদ্রতীরে যে জুতোটা পেয়েছিল তার জোরাটা পেয়ে গেল। ভালভাবে পরীক্ষা করার পর দেখা গেল জুতোর হিলটা সদ্য আঠা দিয়ে লাগান। হিলটা কাটার পর তার ভেতরে একটা কাগজের চিরকুট পাওয়া গেল। সেই চিরকুটে গ্রামের এবং পার্শ্ববর্তী সেনাবাহিনীর ও নগর প্রতিরক্ষার সৈনিকদের অবস্থান আঁকা রয়েছে।

অচেনা লোকটা উপরের ঘরে দুটো বাচ্চা মেয়েকে দেখতে পেয়ে চলে আসবার জন্য ঘুরে দাঁড়াল। জুই-চুয়ান চিৎকার করে বলল: "কোথায় যাবেন ভাবছেন?" লোকটা উত্তর দিল: "দুটো বাচ্চা ছেলে আমাকে দলনেতার সাথে দেখা করতে বলল, কিন্তু কোথায় তিনি?"

জুই-চুয়ান চিৎকার করে বলল: "এখানে! এই যে দলনেত্রী সাগর কুসুম!" মেয়েটির দিকে তাচ্ছিল্যভরে তাকিয়ে সেই লোকটি নিস্পৃহভাবে একটা বেঞ্চিতে বসল। একটা পা আর একটা পায়ের উপর তুলে সে মুখ বেঁকিয়ে বলল: "কি দলনেত্রী, আহা!" বিরক্তির সাথে সে একটি সিগারেট ধরাবার জন্য দেশলাই জ্বালিয়েছে, সাগর কুসুম তার ডেস্কের উপর জোরে শব্দ করে আদেশ দিল: "ভদ্র ব্যবহার করুন!"

এই কথায় লোকটা উঠে দাঁড়াল কিন্তু সাগর কুসুম বলতে লাগল: "আমরা আপনার ঝুড়িগুলো আটকে রাখব কারণ আপনি কোন বিক্রি তালিকা লেখেননি।" লোকটা খুব ঘাবড়ে গেল এবং চিৎকার করে বলল: "ও হ্যাঁ, আমার কাছে আছে! আমার কাছে বিক্রি তালিকা আছে।"

সিয়াও-পো সিঁড়ি দিয়ে না ওঠা পর্যন্ত সাগর কুসুম জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যেতে লাগল, কারণ সে জানে যে এই সময়ের মধ্যে তারা নিশ্চয়ই জিনিস-পত্তর খোঁজার কাজ শেষ করে ফেলবে। সে লোকটাকে সাবধান করে বলল: "এর পরে আরও বিস্তারিত বিক্রি তালিকা তৈরী করবেন। আপনি এখন যেতে পারেন।" সব জিনিষ-পত্তর ঠিক ঠিক আছে দেখে লোকটা তার ঝুড়িগুলো কাঁধে তুলে চলে গেল।

পরের সপ্তাহে এক রাতে যখন শত্রুর কার্যকলাপ ধরা পড়ে গেল, পার্টির শাখার পক্ষ থেকে সাগর কুসুম, সিয়াও-পো ও চি-হাইকে গ্রামের সীমানার একটা জঙ্গল থেকে নজর রাখার দায়িত্ব দেওয়া হল। কিছু পরেই একজনকে সন্ত্রস্ত ও ব্যস্ত অবস্থায় দেখা গেল। সে আর কেউ নয়—সেই মাছ ব্যবসায়ীর বউ। সাগর কুসুম সিয়াও-পোর কানে কানে কি যেন বলল।

সেই মহিলা কাছে আসা মাত্রই সাগরকুসুম আড়াল থেকে লাফিয়ে এসে তার সামনে দাঁড়াল এবং তাকে হুকুম করে জানতে চাইল সে কোথায় যাচ্ছে। মহিলাটি তাকে ছেড়ে দেবার জন্য সাগর কুসুমকে অনুনয় বিনয় করতে লাগল। কিন্তু সাগর কুসুম তাকে ধমক দিয়ে বলল: "পুরোণো সমাজে কতজন গরীব জেলেকে তুমি নির্যাতন ও হত্যা করিয়েছ? গোপনে প্রতিবিপ্লবী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছ। আর এখন ভাবছ তুমি বিনা শাস্তিতে ছাড়া পেয়ে যাবে। অত সহজ নয়!"

মাছ ব্যবসায়ীর বউ দৌড়ে পালাবার চেষ্টা করতেই একজন একটা বেতের লাঠি দিয়ে তার পথ আটকে দিল। ফলে সে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। সাগর কুসুম ও সিয়াও-পো তাকে বেঁধে ফেলল এবং সে স্বীকার করল যে ঐ ফেরিওয়ালার সাথে সে সাগর পথে পালিয়ে যাবার চক্রান্ত করছিল। আর ঐ ফেরিওয়ালাটা একজন শত্রুর চর।

এদিকে নাগরিক বাহিনী ঐ ফেরিওয়ালাকে গ্রামের বাইরে বন্দী করেছে। লী কাকা কমিউনের সেনাবাহিনীর নেতাকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হয়ে দেখলেন যে মাছ ব্যবসায়ীর বউকেও আটক করা হয়েছে। তিনি সাগর

কুসুমকে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করলেন। আর সেই শত্রুর চরকে উদ্দেশ্য করে বললেন: "যদি মনে করে থাকো যে তুমি ছোটদের লালরক্ষী বাহিনীর আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে পালিয়ে যাবে, তবে সেটা তোমার স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়!"

সাগরের দিক থেকে একটা নৌকার শব্দ শোনা গেল। শব্দটা আসছে চীনা গণমুক্তির নৌবাহিনীর একটা যুদ্ধজাহাজ থেকে। সেই যুদ্ধ জাহাজের সাথে বাঁধা রয়েছে শত্রুদের একটি বড় নৌকা। সেই নৌকাটা একটা মাছ ধরার নৌকাকে পাশে রেখে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল। লী কাকা পলায়মান দুই শত্রুকে উদ্দেশ্য করে বললেন: "তোমাদের নিয়ে যাবার জন্য তোমাদের 'মাছ ধরার নৌকা' আসছে।" দুই শয়তান ভয়ে মাথা নীচু করে রইল।

ছোটদের লালরক্ষী দু হাত নেড়ে আগত যুদ্ধ জাহাজকে স্বাগত জানাল। তারা গলা খুলে গান গাইতে আরম্ভ করল। রাতের আকাশ বাতাস মুখরিত করে সেই গান শুরু হল:

লাল ফিতে বাঁধা বর্শাকে কাঁধে তুলে,
চেয়ারম্যান মাওয়ের ছোটদের লালরক্ষী বাহিনী
আমাদের বুকে বল, দৃষ্টি পরিষ্কার,
বিশাল সাগরের তীরে আমরা দেশ রক্ষা করি।
প্রিয় মাতৃভূমির রক্ষী হয়ে ওঠা
আমাদের আজন্ম কামনা, বড় আন্তরিক।





তুষার মানব গড়া

হাও তান

বাতাসের বেগ কমে এল, তুষার ওড়াও বন্ধ হল। পুব আকাশে মেঘের পিছন থেকে সূর্যের লাল রশ্মিগুলি উঁকি দিতে শুরু করল।

ঠিক তখনই, যে রাস্তাটা গ্রামের দিকে গেছে সেখান থেকে একটা বাঁশীর শব্দ ভেসে এল।

ইউলিং একটা ছোট্ট টুলে প্রথমে একটা পা এবং পরে অন্য পা-টা রেখে তাড়াতাড়ি তার মোটা পুরোণো জুতোজোড়া পরে নিল এবং তার পাজামাটার দুটো পা গোড়ালীর কাছে একটা দড়ি দিয়ে বেঁধে নিল। তারপর সে মাথায় একটা শাল জড়িয়ে নিল আর একজোড়া দস্তানা পরে নিল। ইউ-লিং-এর বয়স মাত্র এগার বছর। কিন্তু যখন সে এইভাবে পোশাক পরে তাকে মনে হয় একজন বয়স্ক কমিউন সদস্যা।

ইউলিং তার বাবা-মাকে ক্ষেতে তুষার আনার কাজে সাহায্য করার জন্য তৈরী হচ্ছিল।

ইউলিং-এর ছোট ভাই—ছোট্ট সাই ইস্কুলে সবেমাত্র প্রথম শ্রেণীতে পড়ে। অনেক কিছুই সে এখনো বোঝে না। যেহেতু সে নিজে কাজ করবে না তাই সে তার দিদিকে তার সঙ্গে থেকে খেলা করার জন্য হাত ধরে টানাটানি করতে লাগল। সে দিদির চারদিকে নাচানাচি করে আধোআধো স্বরে বলে চলল—"দিদি, যদি আমার সংগে একটা তুষারমানব না বানাও, আমি আর কক্ষণো তোমার সংগে খেলব না।"

ইউলিং একটু চিন্তিত হয়ে পড়ল। শীতের ছুটির শুরুতে সে তার ক্লাসের বন্ধুদের সংগে ছুটি কাটাবার পরিকল্পনা করেছিল। তারা সবাই একমত হয়েছিল যে তাদের শিক্ষিকার দেওয়া ছুটির পড়া শেষ করার পর তারা

উৎপাদক দলকে সাহায্য করবে। কিন্তু শীতকালে এমন একটা কিছু চাষের কাজ থাকে না। আর যে সব কাজ করা দরকার, সেগুলো বাচ্চাদের পক্ষে সামলানো মুস্কিল। ইউলিং কেবলই ভাবছিল কী ভাবে তারা তাদের পরিকল্পনামত কাজ করতে পারবে। এখন যেহেতু বরফ তোলার কাজে কমিউন সদস্যদের সাহায্য করার একটা সুযোগ এসেছে—কিছুতেই সে আর এই সুযোগ নষ্ট করতে রাজী নয়।

সে তার ছোট্ট ভাইটিকে বুঝিয়ে বলল, "শোন্, তুই বাড়ীতেই থাক। আমি কাজ সেরে বাড়ী ফিরে তোকে নিয়ে একটা বড় তুষারের পুতুল তৈরী করব। তখন কি মজা হবে বল?"

কিন্তু ছোট্ট ভাই মাথা নেড়ে প্রতিবাদ করে বলল "—না, না। তুমি ফিরে আসার আগেই তো তুষার গলে যাবে।"

ইউলিং বুঝিয়ে বলল, "এই তুষার তোলার কাজটা খুবই দরকারী। তুই কি শুনিস নি, বাবা এ সম্বন্ধে কি বলেছিলেন? গত শরতে আমাদের গ্রামে বেশী বৃষ্টি হয়নি। এখন আমরা পাহাড়ের আশপাশ থেকে তুষার নিয়ে গমক্ষেতটা সাদা কম্বলের মত করে ঢেকে দিচ্ছি। যখন এই তুষার গলবে, তখন শীতের গমক্ষেতে আস্তে আস্তে জল ঢালার মতই কাজ হবে। আগামী বসন্তে এই গমগুলো পরিপুষ্ট হবে আর তখন আমরা প্রচুর সুস্বাদু বানরুটি খেতে পারব। সেটা কী চমৎকার হবে বলত?"

ছোট্ট সাই চিৎকার করে বলল—' না, না। আমি তুষারের পুতুল তৈরী করতে চাই।"

ইউলিং ঘেমে উঠল।

ছোট্ট সাই কেঁদেকেটে আকুল।

বাচ্চাদের বাবা-মা ঝুড়ি আর বাঁক কাঁধে ক্ষেতে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে এলেন। বাবা বললেন— "ইউলিং তোমার যাবার দরকার নেই।"

মা বললেন, "ইউলিং তুমি বরং তোমার ভাইকে দেখাশুনা কর।"

এই কথা শুনে ছোট্ট সাই-এর মুখে হাসি ফুটল কিন্তু ইউলিং ভুরু কোঁচকাল।

গ্রামের রাস্তায় লোকেরা হাসতে হাসতে কথা বলতে বলতে উত্তরের ঢালু অংশে যাবার জন্য তৈরী হয়ে এসে জড়ো হচ্ছিল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই কিছু ছেলেমেয়ে এসে ইউলিং-এর বাড়ীর দরজায় উঁকি দিল।

তারা জিজ্ঞেস করল, "ইউলিং তুমি আমাদের বাইরে খেলতে নিয়ে যাবে?"

"আমরা একটা তুষার মানব তৈরী করতে যাচ্ছি! তাই না?"

ছোট্ট সাই তাড়াতাড়ি তার দিদির হয়ে উত্তর দিয়ে বলে উঠল—"হ্যাঁ, হ্যাঁ।"

ইউলিং কি বলবে ভেবে পেল না।

উঠোনের চক্‌চকে সাদা তুষারের ওপর তার কালো ডাগর চোখের দৃষ্টি স্থির হল।

সে এমন একটা মেয়ে যে সবসময়ে তলিয়ে ভাবতে চেষ্টা করে, আর অনেক ভালো বুদ্ধিও তার মাথায় আসে। এখন বরফের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ তার মাথায় একটা বুদ্ধি এল। সে দরজার কাছে তার খেলার সাথীদের ডেকে বলল—"আচ্ছা, চল আমরা একটা তুষার মানব তৈরী করি। তোমরা প্রত্যেক অন্ততঃ দুজন ক'রে বন্ধুকে এই কাজে সংগে নাও। বেশী হলে তো আরো ভালো।"

ছোট্ট সাই আনন্দে লাফিয়ে উঠে ঘোষণা করল, "আমি আরো কয়েক-জনকে সংগে নেব, আমি পাঁচজনকে নেব।"

তারা তাদের বন্ধুদের একসংগে ডাকাডাকি করায় গ্রামের রাস্তাটি মুহূর্তেই বাচ্চাদের ভীষণ কল-কাকলিতে ভরে উঠল।

তারা সব্বাই নানান রঙের পোশাক পরেছে। গরমপোশাক হিসাবে কানঢাকা তুলোয় মোড়া টুপী আর স্কার্ফ পরে, প্রত্যেকে একটা করে বেলচা অথবা ঝুড়ি নিয়ে এক নিমেষে বেরিয়ে এল। সংখ্যায় কমপক্ষে পঁচিশজন।

ইউলিং বলল—"এস আমরা তিনজন তিনজন করে ভাগ হয়ে যাই। তিনজনের প্রত্যেকটি দল একটি তুষারের পুতুল তৈরী করবে। তোমরা রাজী আছ?"

একটি গোলগাল ছেলে বলল—"প্রত্যেক দল তিনটি করে তুষারের পুতুল তৈরী করুক আর আমরা দেখব কোন্‌টা সবচাইতে বড় হয়েছে।"

ছোট্ট সাই বলে উঠল, ' আমি একাই আটটা বানাব।"

চেন-জু বুদ্ধি দিল, "আমরা সব বাড়ীর দরজায় ২টো করে তুষারের পুতুল পাহারাদারের মত বসিয়ে রাখব।"

অন্যদের এই প্রস্তাব এতই চমৎকার মনে হল যে তারা হাততালি দিয়ে উঠল।

ইউলিং বলল, "—আমিও অনেকগুলো তুষার পুতুল তৈরী করতে রাজী আছি। কিন্তু রাস্তায় তুষার এতবেশী পায়ে মাড়ানো আর নোংরা যে তা দিয়ে তৈরী পুতুল দেখতে ভাল হবেনা। তাছাড়া রাস্তাটা সরু। ওখানে আমাদের সবার জায়গা হবে না।"

বাচ্চার প্রশ্ন করল, "তাহলে, কোথায় যাবো?"

"উৎপাদক দলের সব্জী বাগানটাই ভাল জায়গা। সেখানকার তুষার পরিষ্কার আর সাদা, এবং জায়গাটা যথেষ্ট বড়ও..." ইউলিং বলল।

মোটাসোটা ছেলেটির এই যুক্তি এত পছন্দ হল যে সে তাকে শেষ করতে না দিয়েই বলে উঠল, "এটা একটা খেলার মাঠের মতই বড়। আমরা আমাদের তুষার মানবদের এখানে ব্যায়াম করতে লাগিয়ে দেব।"

চেন-জু বলল. "আমরা তুষার-মানুষগুলোকে গোল করে দাঁড় করিয়ে দিয়ে যৌথ নাচের জন্য রাখব।"

বাচ্চারা দল বেঁধে জোর কদমে শব্জী বাগানের দিকে যাত্রা করল। ছোট্ট সাই, ছোট্ট বীরের মত সবার আগে আগে গান গাইতে গাইতে চলল।

বাগানটা সমতল আর পুরু তুষারে আবৃত। একটাও পায়ের ছাপ নেই বা একছিটে ময়লাও লেগে নেই। কলের সদ্যপ্রস্তুত ময়দার মত সাদা। সদ্য পেঁজা তুলোর মত হাল্কা। আর এত মসৃণ যে মনে হয় রোলার চালিয়ে সমান করা হয়েছে।

ইউলিং দেখে খুব খুশী। এই বাগানটা বসন্তে কেমন দেখতে হবে সেই ছবিটা তার মনে ভেসে উঠল। যে কোন জায়গার চেয়ে সবুজ, একটার পর একটা ফসল ফলছে। তারপর সে ভাবল গ্রীষ্মেও এই বাগান কেমন হবে—অসংখ্য উজ্জ্বল লাল টমেটোয় ভর্ত্তি, আর যখন সেই টমেটোগুলো তুলে দিনের বেলা জড়ো করে রাখা হবে তখন তাদের কী উজ্জ্বলই না দেখাবে। সে শরতের কথা ভাবতে লাগল: আধমানুষ সমান লম্বা বড় বড় বাঁধাকপিগুলো দলের ট্রাকে এবং দুচাকার ঘোড়ার গাড়ীতে বোঝাই হয়ে থাকবে শহরে যাবার অপেক্ষায়। কিন্তু এখনও তো শীত...।

বাচ্চারা চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে। ওরা তুষারমানব বানাতে শুরু করেছে।

ইউলিং ডেকে বলল, "দাঁড়াও, আমাদের বাগানের তুষার ব্যবহার না করাই ভাল। চলো রাস্তা আর পাশের নালাগুলো থেকে তুষার সংগ্রহ করে নিয়ে আসি। ওখানে প্রচুর তুষার আছে।"

হৈ-চৈ করে সম্মতি জানিয়ে বাচ্চারা ঠিক একঝাঁক পাখীর মত রাস্তার ও নালার দিকে ছুটে গেল। ঘুমন্ত বাগানটা বেলচা দিয়ে কোপান তুষার-কুচির আলোড়নে আর বাচ্চাদের আনন্দের কলহাস্যে জেগে উঠল।

একের পর এক তুষারের পুতুল তৈরী হতে লাগল। ছোট্ট গোলগাল ছেলেটিরই হল সবচেয়ে বড়। গাধার মল দিয়ে সেটার বড় বড় দুটো চোখ তৈরী করার কাজে ছোট্ট সাই তাকে সাহায্য করল, আর তুষার মানবটির চিবুকে খানিকটা খড় জুড়ে দিল লম্বা দাড়ির মত করে—যা হাওয়ায় উড়তে লাগল। ওটা দেখে কেউই না হেসে পারল না।

চেন-জু কমিউনের একজন নারীসদস্যের প্রতিমূর্তি তৈরী করল তুষার দিয়ে। সেই মহিলাটির গোল মুখ, বাবরিঝুঁটি চুল তৈরী করে এবং তার হাতে একগোছা শস্য গুঁজে দিয়ে সে দারুণ চমৎকার একটা কাজ করল। ছোট্ট সাই একটা হৃষ্টপুষ্ট শিশু গড়ল আর তাকে মহিলাটির পিঠে বসিয়ে দিল।

মেঘ সরে সরে ভেসে যেতে লাগল, আকাশ পরিষ্কার হয়ে সূর্য্যের চোখ ঝলসানো রশ্মি এসে তুষারের উপর পড়ল। এতে বাগানটিকে আগের থেকে দ্বিগুণ সুন্দর দেখাল। বাচ্চারা তাদের তৈরী তুষার পুতুলগুলিকে ঘিরে হাত ধরাধরি করে নাচতে লাগল। এখন ওরা কত খুশী!

হঠাৎ ছোট্ট সাই চমকে দেখল ওয়াং ঠাকুর্দা গ্রামের দিক থেকে এদিকে আসছেন। ওয়াং ঠাকুর্দা শব্জী বাগানটির দেখাশুনা করেন এবং তাঁকে দেখে ছোট্ট সাই ভয় পেয়ে গেল কারণ এই বৃদ্ধ মানুষটি চিরকালই খুব কড়া। সাধারণ সময়ে তিনি বাচ্চাদের এই বাগানে খেলতেই দেন না এবং কেউ যদি দৈবাৎ ঢুকে পড়ে তাহলে সে প্রচণ্ড ধমক খায়।

ছোট্ট সাই তার ঘাড় ঘুরিয়ে চিৎকার উঠল, "পালাও! ওয়াং ঠাকুর্দা আসছেন!"

কিন্তু বাচ্চারা ছত্রভঙ্গ হওয়ার আগেই ওয়াং ঠাকুর্দা এসে পড়ে বললেন, "পালিও না। আমি তোমাদের কিছু কথা বলব।"



পৃষ্ঠা—১৪৩

ওয়াং ঠাকুর্দা বাগানে ঢুকলেন তার তুষার পুতুলগুলির দিকে একবার তাকালেন। তিনি খুশীর হাসি হেসে বললেনঃ "ধন্যবাদ। ছেলেমেয়েরা, এখন তোমাদের আদর করা উচিত।"

বাচ্চারা হতবুদ্ধি হয়ে পরস্পরের দিকে তাকাল।

ওয়াং ঠাকুর্দা বললেন, "তোমরা সব তুষার আমাদের শব্জী বাগানে স্তূপীকৃত করেছ। তোমরা আমাদের উৎপাদক দলের জন্য একটা ভালো কাজ করেছ।"

ছোট্ট সাই ইউলিং-এর হাত টেনে বলল, "দিদি, তুমি··· !"

ইউলিং কিছু বলল না। শুধু হাসল।

ঠাকুর্দা ছোট্ট সাই-এর মাথায় আদর করে চাপড় মেরে বললেন, "একটি ভাল শিশুর উচিত কঠোর পরিশ্রম করে পড়াশুনা করা, কঠোর পরিশ্রম করে খেলাধূলা করা এবং কঠোর পরিশ্রম করে কাজ করা।"

তাঁর কথা শুনে ছেলেমেয়েরা সব বুঝল। আনন্দে তাদের কলহাস্য এত উচ্চকিত হল যে গাছ থেকে তুষার ঝরে পড়তে লাগল।





বিলোজ ঘাটের খেয়া

মার্চের এক উজ্জ্বল বসন্তের দিনে আমি পূর্ব চীন সমুদ্রের ল্যাঙ্গকাঙ্গিউ দ্বীপে আমাদের সৈন্যদের যুদ্ধ প্রস্তুতির সংবাদ-সংগ্রহের জন্য যাচ্ছিলাম। সেই দ্বীপ থেকে আমি বিশ বছরেরও বেশী আগে চলে এসেছি। প্রবল বাতাসের মধ্যে আমি তাড়াতাড়ি বিলোজ খেয়াঘাটে গেলাম। সেখানে চারিদিকে একটাও খেয়ানৌকা চোখে পড়ল না। আমি পাথুরে তীরভূমিতে দাঁড়িয়ে দূরে ল্যাঙ্গকাঙ্গিউ দ্বীপের সীমারেখার দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমি শেষবার যখন এখানে এসে ছিলাম তখনকার একটি ঘটনার কথাআমার মনে পড়ল।

সময়টা তখন ১৯৫০ সালের শুরু—চৌসান দ্বীপের মুক্তির ঠিক আগের সময় সেটা। আমাদের সমুদ্র পার হতে হবে। আমাদের গোপন যোগাযোগ রক্ষাকারী ব্যক্তি মিংহাই-এর সহায়তায় একজন সংযোগকারী হিসাবে আমি খুব তাড়াতাড়ি বেশীর ভাগ খবরই জোগাড় করে ফেললাম।

তারপর ঠিক যখন আমি দ্বীপটি ছেড়ে আসব তখনই অপ্রত্যাশিতভাবে কুয়োমিনটাং সৈন্যবাহিনী খেয়াঘাট অবরোধ করল—সব নৌকোগুলো আটকে সারা দ্বীপটা সরু দাঁতের চিরুণী দিয়ে আঁচড়ানোর মত করে তন্ন তন্ন তল্লাশী করা হল। আমি দিক পরিবর্তন করে দ্বীপটার দূর প্রান্তের পাহাড়ী এলাকার দিকে দৌড়োলাম। শত্রুসৈন্যরা আমার পেছন থেকে গুলিবৃষ্টি করতে লাগল। সবেমাত্র আমি একটা টিলায় উঠেছি, ঠিক তক্ষুণি একটা বুলেট আমার বাঁ কাঁধে বিঁধল। সেই সংকটজনক মুহূর্তে একজোড়া বলিষ্ঠ বাহু আমাকে ধরে ফেলল এবং আমাকে বয়ে নিয়ে চলল।

বৃদ্ধ মিংহাই আমাকে একটা পাহাড়ের গুহায় নিয়ে এলেন। আমার ক্ষতস্থান বেঁধে দিলেন। কিন্তু তখন অবস্থা পাল্টে গেছে, আরো খবর

দরকার; তাই তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সন্ধ্যার মধ্যে খবর নিয়ে ফিরে আসার কথা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

আমার পরিকল্পনা ছিল খবরগুলো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পার্টি কমিটিতে পৌঁছে দেওয়া। আমি অধীরভাবে অপেক্ষা করতে লাগলাম। সাঁঝ বেলায় আমি হঠাৎ একটা সীগালের চীৎকার শুনলাম। আমাদের সংকেত। আমি আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম আর দেখলাম মিং হাই নন, তার পরিবর্তে একটি শিশুকে পিঠে নিয়ে একটি তরুণী জেলের মেয়ে এসেছে।

সে চুলের খোঁপা থেকে বেশ কায়দা করে আমার দরকারী খবরের কাগজটা টেনে বার করে বলল, "কমরেড, আমি আ-চু। মিং হাই খুড়ো আমাকে পাঠিয়েছেন।" আমি সেটা তার হাত থেকে নিয়ে উদ্বিগ্নভাবে প্রশ্ন করলাম, "মিং হাই খুড়ো কোথায়?" আ-চু উত্তর দিল, "খবর সংগ্রহ করে ফেরবার সময় তিনি কুয়োমিনটাং দস্যুদের হাতে ধরা পড়েছেন। ওরা তাঁর ওপর অত্যাচার করেছে কিন্তু তিনি একটি কথাও বলেন নি। আর এই খবরটা তিনি বার করে পাঠিয়ে দিয়েছেন।" ক্রুদ্ধ হয়ে আমি আমার পিস্তলটা টেনে নিলাম এবং জানতে চাইলাম মিং হাই খুড়োকে ওরা কোথায় রেখেছে। আ-চু কেবল বলল, "কমরেড আজ রাতেই আপনাকে পার হতে হবে।"

আমি শান্ত হলাম, ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বললাম, "আজ রাতে কি ভাবে একটি নৌকা পাওয়া যাবে?" আ চু শিশুটিকে তার পিঠ থেকে নিয়ে আমার হাতে দিল। আমাকে সেখানে অপেক্ষা করতে বলে সে উধাও হল। আমি চিন্তিত হলাম। অন্ধকার হলে আ-চু হঠাৎ একটা ছোট্ট সাম্পান বেয়ে গুহামুখে নিয়ে এল। বাচ্চাটিকে পিঠে রেখে সে আদেশ দিল, "তাড়াতাড়ি নৌকায় উঠুন।" আমি জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে সে শত্রুর ঠিক নাকের ডগা দিয়ে নোঙর করা অবস্থা থেকে এটা নিয়ে এসেছে।

ঝড়ে উত্তাল সমুদ্রের মধ্যে ঠিক যখন সাম্পানটি খেয়াঘাটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, আ-চু সতর্ক করে দিয়ে বলে উঠল, "একটা ভারী কামানবাহী নৌকা।" আমি কান পেতে শুনতে পেলাম বাতাসের গর্জন ছাপিয়ে একটা মোটরের শব্দ। দূর থেকে একঝলক সাদা আলো আমাদের ওপর দিয়ে খেলে গেল। আমি পিস্তল টেনে নিয়ে যুদ্ধের জন্য তৈরী হলাম। কিন্তু আ-চু শক্ত করে হাল ঘুরিয়ে সাম্পানটিকে ডান দিকে চালিয়ে দুই পাহাড়ের মাঝে একটি সরু নালার ভেতর ঢুকিয়ে দিল, যাতে তা আলোর নাগালের মধ্যে না পড়ে

তারপর সাম্পানটি স্রোতের টানে ভেসে চলল আর শীঘ্রই সেই পাহাড়দুটোকে পিছনে ফেলে এল। তিন ঘণ্টা পরে অ-চু আমাকে বিলোজ খেয়াঘাটে পৌঁছে দিল। মুখ থেকে ঘাম মুছে সে বলল, "কমরেড, আশা করছি আমাদের নিজস্ব সেনাবাহিনী এসে আমাদেরকে বিপদ থেকে মুক্ত করবে।" আমি আ-চুর হাত-দুটো চেপে ধরে তাকে আশ্বাস দিলাম।

সব কিছু ঘটেছিল বিশ বছরেরও আগে। এখন, এখানে ফিরে এসে আমি সেই সাহসী মহিলা আর তার সুন্দর শিশুটির কথা ভাবছি। হঠাৎ দেখতে পেলাম দূরে ফেনায়িত তরঙ্গের ওপর লাল রং-এর একটা ঝলক। যতই সেটা কাছে আসতে লাগল, আমি পরিষ্কার দেখতে পেলাম যে এটা একটি তরুণীর লাল জ্যাকেট।

সে সোজা হয়ে, রাইফেল কাঁধে একটি ছোট্ট নৌকার ওপর দাঁড়িয়ে আছে এবং তার সংগে আছে আরো দুটি মেয়ে। আমি ঘাটের কাছে দৌড়ে গিয়ে টুপী খুলে সজোরে নাড়তে লাগলাম। যখন নৌকাটি ঘাটের কাছে এল, লাল পোষাকের মেয়েটি চীৎকার করে বলল, "কমরেড, আপনি কোথায় যাচ্ছেন?" আমিও চীৎকার করে বললাম যে আমি ল্যাঙ্গকাঙ্গিউ দ্বীপের দিকে যাচ্ছি। মেয়ে তিনটি নৌকা ভেড়াবার আগে আমার আপদমস্তক দেখে নিল। আমি তাদের আমার পরিচয় পত্র দেখালাম। তারপর লাফিয়ে তাদের নৌকায় উঠলাম।

লাল পোশাকের মেয়েটি নির্দেশ দিল, "পাল তুলে দাও।" এক মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে অন্য দুজন পাল তুলে দিল। আমি তাদের কাছ থেকে জানতে পারলাম লাল পোশাক পরা মেয়েটির নাম হাই-ইং আর অন্য দু'জনের নাম সুই-চু আর হাই-হুয়া। তারা সামুদ্রিক লক্ষ্যভেদ অনুশীলনে বেরিয়েছে।

যখন সুই-চু আর হাই-হুয়া তাদের রাইফেলের লক্ষ্য স্থির করছিল তখন আমি ক্ষমা চেয়ে হাই-ইংকে বললাম, "আমাকে পার করে দেওয়াতে তোমাদের সেনাবাহিনীর অনুশীলনতে ব্যাঘাত ঘটল না তো?" হাই-ইং মাথা নেড়ে বলল যে আদপেই তা নয়, তাদের শিক্ষক তাদের বলেছেন যে নৌ-সেনাবাহিনীর রক্ষীরা অবশ্যই ঝড় আর ঢেউ-এর মধ্যে অনুশীলন চালাবে। ঠিক তখনই বাঘ-মাথা পাহাড়ের দিক থেকে হঠাৎ একটা গোলা বিস্ফোরণের আওয়াজ হল এবং হাই-ইং চিৎকার করে বলল, "কমরেড,

যুদ্ধের জন্য তৈরী হও। দিক পরিবর্তন কর। বাঘমাথা পাহাড়ের দিকে ঘুরে যাও আর দেখ শত্রুরা কোন পর্যায়ে আছে।"

হাই-ইং হাল ধরে সাম্পানটিকে দ্রুত বাঘমাথা পাহাড়ের দিকে ঘুরিয়ে দিল। আধঘণ্টা পরে আমরা আমাদের ঠিক সামনে ঠিক বাঘের থাবার মতই খাঁজ কাটা একটা টিলা দেখতে পেলাম।

হাই-ইং জোর গলায় নির্দেশ দিল, "পাল নামিয়ে দাও। সুই-চু আর হাই-হুয়া কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে বড় পালটি নামাতে লাগল, আর তারপর জোরে হালটা টেনে ধরল। আমি দাঁড়টিকে শক্ত করে ধরে টানতে লাগলাম।

সাম্পানটি দ্রুতবেগে একটি আংশিক ডুবে-থাকা টিলা পার হয়ে চলতে লাগল। "দেখ।" সুই-চু বাঘের মুখে ফেনার মধ্যে একটি ছায়ামূর্তির দিকে নির্দেশ করল। হাই-হুয়া তার রাইফেলের লক্ষ্য স্থির করল কিন্তু হাই-ইং তাড়াতাড়ি তাকে থামাল। "উত্তেজিত হয়ো না। আমরা ওদের জ্যান্ত ধরব।"

এক ঘণ্টা সংগ্রামের পর আমরা বাঘের মুখ পৌঁছলাম। কিন্তু দেখলাম সেখানে শুধু চারটে বিরাট বিরাট পাহাড় জলের মধ্যে থেকে মাথা তুলে আছে—দেখে মনে হচ্ছে যেন বিশাল বিশাল থাবা—চারপাশে সাদা ফেনার গুঁড়ো লেগে আছে। পাহাড়গুলোর মাঝখানে ঢেউগুলোর বাইরে ও ভেতরে আসা যাওয়া দেখে মনে হচ্ছিল যেন বাঘের মুখে একটি আবর্তের সৃষ্টি হয়েছে।

আমরা সকলে আমাদের প্রচেষ্টা দ্বিগুণ করলাম কিন্তু বাতাস আর স্রোত আমাদের পেছনে ঠেলে দিতে লাগল। হাই-ইং চীৎকার করে বলল, "কমরেড বাঘের মুখ বা ঝড় যত ভয়ংকরই হোক না সেটা কোন ব্যাপারই নয়, আমরা নিশ্চয়ই তা পার হয়ে যাব এবং শত্রুদের পালাতে দেব না।"

ঠিক তখনই নৌকা বাঘের মুখের সামনে এল। একটা ফেনাভরা বিশাল ঢেউ সেটাকে আমাদের দৃষ্টির আড়াল করে দিল। যখন ঢেউ পিছু হটে গেল, নৌকাটাও অদৃশ্য হল এবং হাই-হুয়া দুঃখের সংগে বলল, "আমাদের উচিত ছিল গোড়াতেই ওকে ধরা।" "ও পালাতে পারবে না, ওকে তাড়া কর," হাই-ইং চিৎকার করে বলল। আমরা যখন বাঘের মুখের ওপর আর একটা আক্রমণ চালাচ্ছিলাম ঠিক তখনই একটা পাহাড় সমান জলের ঢেউ আমাদের দিকে ছুটে এল এবং হাই-ইং তাড়াতাড়ি একটা টিলাকে এড়াবার জন্য নৌকার মুখ ঘুরিয়ে দিল। ঢেউভাঙ্গা পাহাড় আর টিলাগুলো আমাদের পেছনে পড়ে রইল।

বাঘের মুখ থেকে বেরিয়ে আমরা আমাদের বাঁ দিকের পাহাড়ে

নোঙর করা একটা নৌকা আবিষ্কার করলাম। একজন বয়স্কা জেলেনী, কোমরে পিস্তল গোঁজা, সোজা হয়ে গলুই-এ দাঁড়িয়ে আছেন। হাই-ইং স্যালুট করে বলল, "এই যে, আমাদের রাজনৈতিক শিক্ষক!" "তোমরা কি গুলি করেছ? তোমরা কি বাঘের মুখ থেকে যে শত্রু পালাল তাকে ধরেছ?"

"আমরা তাকে এখানে পেয়েছি!" বড় নৌকার মেয়েরা হাসতে লাগল। তারপর তাদের একজন সমুদ্র থেকে একটা দড়ি টেনে আনল যার এক প্রান্তে লক্ষ্যভেদ অনুশীলনকারীদের জন্য একটা নকল মূর্তি বাঁধা আছে। অর্থাৎ রাজনৈতিক শিক্ষিকাটি হাই-ইং ও অন্যদের পরীক্ষা করার জন্যই এটা ব্যবহার করেছিলেন। "তোমাদের রাজনৈতিক শিক্ষিকা সত্যই সপ্রতিভ!" আমি মন্তব্য করলাম। যখন বয়স্কা জেলেনী আমার দিকে তাকালেন, হাই-ইং তাঁকে বলল, "এইকমরেড আমাদের দ্বীপে যাচ্ছিলেন, কিন্তু কোন খেয়া না থাকায় উনি আমাদের সংগে এসেছেন।"

বয়স্কা জেলেনী এবং আমি প্রায় একই সংগে চমকে উঠলাম। তারপর তিনি আমাদের নৌকায় এলেন এবং আমার হাত দুটি চেপে ধরলেন। কেন না, মহিলাদের এই নৌসেনা বাহিনীর দক্ষ রাজনৈতিক শিক্ষিকাটিই আ-চু। তাকে বিশ বছর আগের থেকে বরং আরো কর্মঠই লাগছে। আ-চু খুশীমনে হাই-ইংকে দেখিয়ে বললেন আমি তাকে চিনি কি না। "ও হচ্ছে সেই বাচ্চাটি যাকে সেদিন আমি আমার পিঠে নিয়েছিলাম। দেখুন ও কত বড় হয়েছে!"

তারপর আমি প্রশ্ন করলাম মিং হাই খুড়ো এখনো জীবিত এবং সুস্থ আছেন কি না। তিনি বললেন, যে তাঁর বয়স এখন সত্তরের কোঠায় এবং এখনও তিনি খোলা সমুদ্রে নৌকা বাইতে পারেন।

বাতাস আরো জোরে বইতে লাগল। ঢেউগুলো পাল তুলে বাতাসে ভেসে দুটি ঝড়ের পাখীর মত ল্যাঙ্গকাঙ্গিউ দ্বীপের দিকে চলল। ভোরের সূর্যালোক ঘন মেঘ ভেদ করে সারা পূর্বসমুদ্র এবং দেশরক্ষী মহিলাদের গাঢ় লাল রঙে রাঙিয়ে দিল।

